পরিচয়

শ্রীনিশিকান্ত বন্দে

প্রকাশক—
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১ম সংস্করণ ১৩৪০

মূল্য এক টাকা মাত্র।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বেলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৯২বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে—
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

— ভূমিকা —

১৯২৬ সালে কল্‌কাতায় যখন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা সুরু হয়, আমরা তখন রাজাবাজারে—নং বাড়ীতে ছিলাম। ঐ অঞ্চলে দাঙ্গার প্রকোপ—বিশেষতঃ আতঙ্ক—ক্রমে বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় এক মুসলমান ভদ্রলোকের সাহায্যে কোন রকমে ভবানীপুরে উঠে আসি। যেদিন নূতন বাসায় এলাম সবেমাত্র তার আগের দিন সে বাসাখানি খালি হয়েছে। আগেকার ভাড়াটেরা দয়া করে অনেক কিছু আবর্জ্জনাই আমাদের জন্য সঞ্চিত রেখে গেছেন। তিন ভাই বোনে মিলে বহুক্ষণের চেষ্টায় সে গুলো আমরা দূর করি। উপরের একখানি ঘর থেকে ভাঙ্গা শিশি বোতল ও পুরাণো কাগজ পত্র সরাতে গিয়ে পিস্‌ বোর্ডের একটা জুতোর বাক্সে মেয়ে হাতের লেখা একগাদা চিঠি ও মোটা একখানি খাতা দেখতে পাই। শুকু ও খোকাকে ছুত করে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ খাতা ও চিঠিপত্র গুলি সব সরিয়ে ফেলি। পরে সে গুলো পড়ে দেখি গোপন করবার মত ওতে তেমন কিছুই নেই, অথচ যা আছে তা প্রায় গল্পের মতই শুনায়। তাই ১৯২৮ সালের "ধূপছায়ায়" এ গুলো ছাপতে দিয়েছিলাম, এবং "পরদেশী চিঠি" নামে ধারাবাহিক বের হচ্ছিল; কিন্তু ঐ কাগজখানি হঠাৎ উঠে যাওয়ায় সবটা বের হতে পায়নি। বই

আকারে বের করবার দুরভিসন্ধি কোন দিন আমার মনে জাগেনি, তবু জনৈক বন্ধুর বিশেষ আগ্রহে আজ তা পুস্তক আকারেই বের করতে হোল। পাঠক পাঠিকা যদি আমার ঐ অতি উৎসাহি বন্ধুটির এই অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন তবেই আমার উত্তম সফল।

আমার মত আনাড়ির পক্ষে দূর থেকে বই ছাপবার প্রয়াশ যে কতবড় ধৃষ্টতা, বই খানিতে অশংখ্য ভুল ক্রটীই তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। এই ভুল ক্রটীর জন্য অনুতপ্ত অন্তঃকরণে আমি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

রেঙ্গুন।
১০ই নভেম্বর ১৯৩৩।

শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচয়

— এক —

গেণ্ডেরিয়া
২রা ডিসেম্বর।

ভাই মিনি,

তোর সাতাশে নভেম্বরের চিঠি পেয়ে খুবই খুসী হয়েছি। আমাদের এখানকার স্কুল ও জায়গাটার অনেক বিবরণ তো তোকে আগের দু' চিঠিতেই লিখেছি; তবু তুই কেবলই নূতন খবর চাস্, বেশ। এবার সত্যি একটা চমৎকার খবর দোব।

গত রবিবার আমাদের নারী সমিতিতে একটি বাঙ্গালী মহিলাকে অভ্যর্থনা করা হ'য়েছিল। তিনি সম্প্রতি তাঁর স্বামীর সঙ্গে জাপান বেড়িয়ে এসেছেন তাঁর কাছে জাপানীদের জাতীয় উন্নতির নানা রকম কাহিনী শুন্‌তে যে কি চমৎকার লাগ্‌ছিল, সে আর কি বলবো।

তিনি বল্‌লেন,—তোকিও সহরে হঙ্গকু নামক অঞ্চলে একটি জাপানী হোটেলে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। জাপানের সেই বিশাল রাজধানীর সর্ব্বত্রই তখনও সেই ভীষণ-নিষ্ঠুর ভূমিকম্পের ধ্বংশলীলার সহস্র চিহ্ন চোখে পড়ে। কিন্তু সেই ধ্বংসের ভিতর থেকেই যেন কোন্ যাদুকরের অলক্ষ্য ইঙ্গিতে অসংখ্য সৌধ শ্রেণী দিন দিন বেড়ে উঠে জাপানীদের অবিচলিত অধ্যবসায় ও উদ্যমের পরিচয় দিচ্ছে। ঐ স্বল্পভাষী অক্লান্তকর্ম্মী জাপানীরা তোকিওর

মতো (কলকাতার চেয়ে প্রায় তিন গুণ বড়) একটি বিরাট সহরের পুনর্গঠনও যে কত শৃঙ্খলায়, কত বিনা আড়ম্বরে হতে পারে তা প্রমাণ করতেই যেন ব্যস্ত। কিন্তু এহেন সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংশের অভিনয় কল্‌কাতা বা বোম্বেতে হলে যে কি হতো, তা ভাবতেও শিউরে উঠ্‌তে হয়,—কল্পনা অবসন্ন হয়ে আসে। আর ক্ষুদ্রকায় জাপানীরা সর্ব্ব বিপদে জয়ী হতে ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত রাখতে কৃত সঙ্কল্প; এই লুপ্ত সমৃদ্ধির জন্য আপশোষ করবার অবসর তাদের কোথায় ?

জাপানের পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীগণ প্রকৃতির যে সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি, মৃত্যুর যে ভীষণ দৃশ্য, ধ্বংশের যে নির্ম্মম ছবি দেখেছে তা কখনো তারা ভুলতে পারবে না,—মানুষ তা পারে না। কিন্তু তার জন্য আছে শুধু একটী দীর্ঘশ্বাস ও এক ফোঁটা অশ্রু। তাও সম্পত্তির শোকে ততটা নয়—জাপানের লোকক্ষয় ও বলক্ষয়ের জন্য যতটা।

তিনি বল্‌ছিলেন,—নৈরাশ্যের চিহ্ন কোথাও দেখিনি। এমন কি লক্ষপতি, যিনি বৃদ্ধ বয়সে ঐ আকস্মিক বিপদে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, সন্তান-সন্ততি প্রিয়জন সবই ঐ নিদারুণ ধ্বংস যজ্ঞে আহুতি দিয়েছেন, তিনিও কর্ত্তব্যের আহ্বানে আজ কর্ম্ম-যজ্ঞে ব্রতী। বড় ঘরের ছেলে—আভিজাত্যের গর্ব্বে কায়িক পরিশ্রমের কাজ এক সময়ে যাঁরা নিতান্তই হেয় মনে করতেন, আজ তাঁদের কাছেও, এমন কি মজুরের কাজও আর তুচ্ছ নয়; নইলে দেশের এই মহা ক্ষতি যে শীঘ্র পূরণ হবে না, জাপান যে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতির সঙ্গে সমান গৌরবে চলতে পারবে না! তার এই নব লব্ধ জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার কঠোর সাধনার নিকট শোক, দুঃখ,

দুর্ব্বলতার স্থান কোথায়? জাপানের এই জাতীয় দুর্দ্দিনে দেশ-মাতার এমন কুসন্তান কে আছে যে প্রাণান্ত চেষ্টায় দেশের ক্ষতি পূরণে বিমুখ হবে? প্রত্যেক দেশ ভক্তের একাগ্র সাধনার ফলেই না জাতি এত দূর উন্নত ও সম্মানার্হ হয়েছে,—তাতে শৈথিল্য এলে আবার যে পিছিয়ে পড়তে হবে!

তারপর তিনি আক্ষেপ করে বল্লেন যে দুঃখিনী ভারত মাতার সন্তান আমরা, এখনো কিন্তু পথ খুঁজেই পাচ্ছি না। সম্মুখের অজানা নূতন পথ, না পশ্চাতের চির পরিচিত পথ—কোন্‌টি বরণীয়, আজ দেড়শ বছরেও তার বিচার শেষ হল না। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে জগতে কত কীই না ঘটে গেলো! কত অনুন্নত জাতি—অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও প্রাচীন প্রথার মোহ-পাশ ছেদন ক'রে মুক্তি লাভ—শক্তি লাভ করলো; নিজেদের অন্ত-র্নিহিত প্রতিভার সন্ধান পেয়ে—বিকাশ করে—মানব সমাজে বরণীয়—স্মরণীয় হলো! সেই সব দৃষ্টান্ত দেখে আজও কী আমাদের চৈতন্য এসেছে—মোহ ঘুচেছে? জাপান, তুরস্ক, আফগানিস্থান ও পারশ্য, আজ যে নব-জীবনের সন্ধান পেয়েছে, সে কি সামনে এগিয়ে আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করে—না পিছনে হটে প্রাচীন ব্যবস্থায় ফিরে গিয়ে? দেশ ও জাতীকে সুস্থ সবল করতে হলে এ কথাটি বুঝে দেখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। পরের ঘাড়ে দোষ চাপালেই সমস্যার সমাধান হয় না—দুঃখ দুর্গতি ঘোচে না! সমস্ত পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টাই মনুষ্যত্ব।

আর একটি কথা—দেশের কাছে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবীর ত আর অন্ত নেই, কিন্তু দেশকে দান করবার আমাদের

কিছু আছে কী? দাবীর দিকে যাদের যত বেশী ঝোক, দানের দিকে ঝোক্ যেন তাদের ততই কম। যাদের দাবীর তালিকা যত দীর্ঘ, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে আজ হয়তো তাদের প্রশংসা প্রতিপত্তি ততই বেশী, কিন্তু এ ভাব কতদিন টিক্‌বে? ভারতের অনাগত বংশধরগণও কি আমাদের দাবীর তালিকার বহর দেখেই চিরদিন ভক্তি-আপ্লুত নেত্রে আমাদের স্মৃতি পূজা করবে, না আমাদের দানের হিসাবটাও একবার দেখতে চাইবে? দাবীর ক্ষেত্রেই প্রতিযোগীতা—দানের ক্ষেত্রে তা নেই; আর দাবী নিয়েই যত ঝগড়া মনোমালিন্য—দানের ক্ষেত্রে তা হতেই পারে না। তবে অবশ্যি দানের চেয়ে দাবী দ্বারা যশ অর্জ্জন—ক্ষণস্থায়ী হলেও—সহজ সাধ্য।

তিনি আরও বলছিলেন—যে সেই বিদেশে তাঁর বাঙ্গালী পরিচ্ছদের নূতনত্ব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বন্ধু লাভের পক্ষে মোটেই অসার্থক হয়নি। পার্ক, মন্দির, স্কুল প্রভৃতি যখনি যা দেখতে যেতেন, সর্ব্বত্রই বহুলোক ব্যগ্রভাবে এসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতো।

তোকিওতে পৌঁছবার পরের দিন বিকালে তাঁরা উয়েনো পার্কে বেড়াতে যান। মিসেস্ রায় বলছিলেন—ঐ উদ্যানটি আয়তনে যেমনি বড়, দেখতেও তেমনি মনোরম। ভূমিকম্পে এর বিশেষ ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। সুবিস্তীর্ণ একটি টিলার উপরিভাগ প্রায় সমতল করে তারি উপর নানা বৃক্ষ-লতা-পুষ্প সুশোভিত ঐ উদ্যানটি রচিত। পার্শ্বে পশ্চিমে বৃহদায়তন একটি হ্রদ, তাতে অসংখ্য পদ্ম-ফুলের শোভা। পার্ক থেকে ঐ হ্রদের দিকে তাকালে কতই না নীচু বলে মনে হয়। ঐ হ্রদের

তীরবর্ত্তী গৃহ-শ্রেণী সন্ধ্যার ম্লানালোকে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে সে দৃশ্য ভোলাবার নয়।

"উয়েনো পার্কের এক প্রান্তে একটি পশু শালা। আলীপুরের চিড়িয়াখানার মতো অত জম্‌কালো না হলেও বেশ দেখবার মতো। সেখানে ভারতীয় একটি হাতীর বন্দি-দশা দেখে বড়ই দুঃখ হলো। ব্যাচারাকে এমনি নিষ্ঠুর করেই বেঁধে রেখেছে যে তার পিছনের একখানি পা নড়াচড়া করবার উপায় নেই। বিদেশ ভ্রমণ কালে স্বদেশের একটি পশু পক্ষীর সাক্ষাতেও মনে আনন্দ ধরে না।"

জাপানে যখনি তাঁরা কোনও উদ্যান, হ্রদ বা মন্দির দেখতে গেছেন তখনি আরও একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখেছেন—সে হচ্ছে জাপানের শিশু ও বালক বালিকা। তিনি বলছিলেন—এমন পরিচ্ছন্ন পরিপাটি—এমন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি বুঝি আর কোথাও নেই। যখনি তাদের সংস্পর্শে এসেছি, তখনি তাদের শিষ্টাচার ও নির্ভীকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। শিশু ও বালক বালিকারা, পরিবার ও জাতির যে কি মহা-সম্পদ, জাপানীরা তা বেশ বুঝেছে এবং বুঝেছে বলেই ছেলে মেয়েদের মানুষ করার দিকে তাদের এমন সতর্ক দৃষ্টি।

আমরা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের কতই না বড়াই করি! কিন্তু এমন শস্য-শ্যামলা দেশে জন্মেও অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন কাটানো—দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত হয়ে অকালে ইহলীলা সম্বরণ করা—একি এতই বুদ্ধির পরিচায়ক? বঙ্গদেশের মতো জাপান এমন সুজলা সুফলা নয়—ঐশ্বর্য্যের এত সব সম্ভার সাজায়ে জাপানীদের দেশ-জননী সন্তানদের সম্মুখে ধরেন নাই, তবু কিন্তু জাপানীরা আমাদের মতো

এত দরিদ্র নয়—এমন হীন স্বাস্থ্য স্বল্পায়ু নয়। আমাদের এ দুর্গতি—এ হীনতা ঘুচাতে হলে, নিজ নিজ পরিবারের বালক বালিকাদের নবীন আদর্শে শক্ত সবল ক'রে—বর্ত্তমান জগতের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। অতীতের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে আর চলবে না, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা যে আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়েছি—যে রকম গতানুগতিক শিক্ষা পেয়েছি—এখনকার ছেলে মেয়েদের জন্য সে ব্যবস্থা মোটেই উপযোগী নয়। এ কথা ভুললে চলবে না যে আমাদের জীবন যখন মধ্যপথ অতিক্রম করেছে, এদের জীবন তখন আরম্ভ মাত্র, এবং আমরা চলে যাওয়ার পরও ত্রিশ চল্লিশ বছর এদের জীবন সংগ্রাম চলবে। কাজেই পঁচিশ বছর আগেকার আদর্শ ও আবহাওয়া ঘরে জমিয়ে রেখে তার মধ্যে যদি ছেলে মেয়েদের 'মানুষ' করি, তাহলে অতীতের জন্য তাদের প্রস্তুত করা হয় বটে, ভবিষ্যতের জন্য নয়। তাহলে এই দ্রুত পরিবর্ত্তন-শীল জগতের সঙ্গে পা মিলিয়ে তারা চলতে পারবে না, চলতে গিয়ে হুচট্ খেয়ে পড়বে এবং অন্যের পদদলিত হয়ে অচিরে অতীতে মিলিয়ে যাবে। মোহ বশে যাঁরা এমনি করে অতীতকে ধরে রাখতে চান তাঁরা সন্তান ও স্বজাতীর বড়ই অকল্যাণ করেন।

জাপানের ঘরে ঘরে মানুষ গড়ার একাগ্র সাধনা তাই জাপান এত উন্নত, আর ভারতের সর্ব্বসাধারণ ত দূরের কথা, শিক্ষিত সম্প্রদায়,—এমনকি পরম পূজ্য নেতাগণেরও অনেকেই—স্বীয় সন্তানদের মানুষ করা বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিয়ে পরিবার ও দেশের ক্ষতি করেছেন। কাজেই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জাপানের সৌভাগ্য যেমনি তার সন্তানদের সুকৃতির পুরস্কার,

ভারতের বর্ত্তমান দুঃর্ভাগ্যও তেমনি আমাদের দুষ্কৃতির শাস্তি। দেশের দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে, তিনি মানুষ গড়বার মহাসাধনায় প্রবৃত্ত না হয়েই পারেন না। যতদিন দেশে যথেষ্ট সংখ্যক প্রকৃত মানুষের আবির্ভাব না হবে, ততদিন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর হবে না। কাজেই মানুষ গড়ার আয়োজনই প্রথম কাজ।—পরিবার ও জাতির গৌরবের এবং সকল মহৎ অনুষ্ঠানের ভিত্তি। আমরা মায়ের জাতী, আমরা যদি মানুষ গড়বার ব্রত গ্রহণ করি, যদি প্রকৃত দৃষ্টান্তে ছেলে মেয়েদের শৈশব থেকেই শিষ্টাচার, সাহস ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিই, তবে জাতির এই দুঃখ দুর্গতি অচিরেই ঘুচে যাবে। জাতির ভবিষ্যৎ আমাদের বর্ত্তমান কাজের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য দৈববলে ঘটে না, কর্ম্মফলেই তা আসে।

জাপানের মত কালোপযোগী আদর্শ সামনে রেখে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও যদি নিজেদের পরিবারে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষ গড়বার ব্রত গ্রহণ করেন, তবে ভারতের সুখের দিন আবার ফিরে আসবে। আপনারা দারিদ্রের কথা তুলচেন; কিন্তু মনে রাখবেন, মানুষের কোন মহৎ উদ্যমই কখনও অর্থের অভাবে ব্যর্থ হয় নি। মনের দারিদ্রই আমাদের উন্নতির অন্তরায়—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একনিষ্ঠ জাতির কি অন্য কোনও বিঘ্ন থাকতে পারে ?

তিনি আরও কত সুন্দর সুন্দর কথা বল্লেন—সবই ত আর এক চিঠিতে লিখে শেষ করা যাবে না; আর তেমন্নি করে' গুছিয়ে লিখবার ক্ষমতাও আমার নেই? তবে যদি তোর ভাল লাগে তা'হলে চিঠির উত্তরে ফের লিখবো। তাঁর বক্তৃতা যে খুবই ভাল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং

সমিতির পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমার মনে দুঃখ হচ্ছিল এই বলে যে, যাঁরা একবার বিদেশে যান তাঁদের চোখে দেশের কিছুই আর ভাল লাগে না—এবং বিদেশের সবই একেবারে চমৎকার।

সমিতির মিটিংএর পর বহু অনুরোধ করে' তাঁকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিলাম। এক পেয়ালা চা খাওয়াবার জন্যে, কেননা আমাদের সমিতিতে পান খাওয়ান ও সিঁন্দুর ছোঁয়ান ছাড়া আর কিছুরই ব্যবস্থা নেই। চা খাওয়ার সুযোগেও জাপান সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনা গেল, এবং জাপানের কয়েক খানি সুন্দর সুন্দর ছবিও তিনি দেখালেন। তাঁরা কালই শিলং চলে যাচ্ছেন এবং কলিকাতায় ফির্‌বার পথে আবার এখানটা হয়ে যাবেন। তখন এসে ডাক্-বাংলোয় না উঠে আমাদের বাড়ীতে দু'চার দিন থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ কর্‌লুম—বাবাও বল্লেন। তিনি বলেছেন পরে লিখে জানাবেন। যদি আসেন, কি মজাই হবে?

পিসিমা সেদিন কি কাণ্ডটা করে' বসেছিলেন জানিস? আমাদের চা.খাওয়া শেষ না হতেই তিনি জপের মালা ঘুরাতে ঘুরাতে একেবারে বারান্দায় এসে হাজির। মিসেস্ রায়, অর্থাৎ সেই জাপান ফের্‌তা মহিলাটি উঠে যাচ্ছিলেন—তাঁকে নমস্কার কর্‌তে। বাবা বলে উঠলেন—আপনি বড়্‌দিকে ছুঁয়ে দিলে ওঁর আবার এই অবেলায় নাইতে হবে।

মিসেস্ রায় তখন দূর থেকে নমস্কার করেই নিরস্ত হলেন। দু'মিনিট যেতে না যেতেই পিসিমার মালা জপ শেষ হয়ে গেল। তিনি জিগ্যেস করলেন—তা তুমি বামুনের মেয়ে ত মা?

মিসেস্ রায় জানালেন—আজ্ঞা হাঁ।

পিসিমা আপন মনেই বল্‌তে লাগ্‌লেন—তা' কি আর দেখে চেনা যায় না? এমন সতী লক্ষ্মী ভগবতীর মত চেহারা—একে ছুঁলে নাইতে হবে কেন? ষাট!

মিসেস্ রায় আমার অনুরোধে তখনই একটি সন্দেশ নিয়ে মুখে দিতে যাচ্ছিলেন, হটাৎ তাঁর হাত থোক সেটা মেজেতে পড়ে গেল; আর মুহূর্ত্তে তাঁর মুখখানি একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাবাও আশ্চর্য্য হলেন।

একটু পরেই কিন্তু মিসেস্ রায়ের সে ভাব কেটে গেল। তিনি একটু মৃদু হেঁসে বল্লেন যে তাঁর মাথায় কি একটা পীড়া আছে—কখনো কখনো এমন হয়,—আবার তখনি সেরে যায়—ও কিছু নয়।

অবশ্য তিনি আর কিছুই খেলেন না। অবশিষ্ট চা'টুকুন নিঃশেষ করেই চলে যেতে চাইলেন। বাবা বল্‌লেন,—সইসকে গাড়ী জুত্‌তে বলা হয়েছে। একটু অপেক্ষা করুন, রাণু আপনাকে ডাক্-বাংলায় পৌছে দিয়ে আস্‌বে

আমিও তৈরী হয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে ডাক্-বাংলায় চল্লুম।

ভাখ, চিঠিটা বড্ড লম্বা হয়ে গেল আজ এখানেই শেষ করি। আশা করি ভাল আছিস।—ইতি—

তোর—রাণু।

— দুই —

গেণ্ডেরিয়া।

ভাই মিনি,   ৭ই ডিসেম্বর।

তোর পাঁচ তারিখের চিঠি খানি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি, আমার আগের চিঠিতে সেই জাপান ফের্‌তা মহিলাটির বক্তৃতার যে টুকু তোকে লিখেছিলাম, তা' তোর খুব ভাল লেগেছে, ভাল কথা। কিন্তু তুই যে সব কথাই শুনবার জন্য অস্থির হয়েছিস, সেই হয়েছে মুস্কিল; কেন না, সব কথা দু'এক খানা চিঠিতে হবে না।

উয়োনো পার্কের কথা তো তোকে আগেই লিখেছি! তিনি বল্‌ছিলেন প্রথম যে দিন তাঁরা উয়োনো পার্কে বেড়াতে যান, সেদিনই সেখানে এক প্রৌঢ় জাপানী দম্পতীর সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়, সে আলাপ, পরে যে এতটা বন্ধুত্বে পরিণত হবে, সেদিন তা' তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই জাপানী দম্পতীর নাম "সুমিমতো"। উভয়েই ইংরেজী বলতে পারেন, তবে অক্লেশে বা অনর্গল ভাবে নয়। মিসেস্ রায় বল্‌ছিলেন যে তাঁর স্বামী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যাওয়ার পথে কয়েক মাস জাপানে ছিলেন, এবং জাপানী ভাষাও তখন শিখেছিলেন তাই জাপানে অবস্থান কালে ঐ দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তাঁদের তেমন অসুবিধা হয় নি।

তিনি এ-সম্বন্ধে আরও বলছিলেন,—সুমিমতোরা আমাদিগকে অভিবাদন ক'রে জিগ্যেস্ করলেন,—আমরা ভারতবাসী কিনা? আমরা 'স্বীকার' করায় সুমিমতোসান হর্ষোৎফুল্ল মুখে বল্লেন

যে, জাপানে একটি ভারতীয় দম্পতির সাক্ষাৎ লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি স্বীকার করলেন যে পূর্ব্বে আর কখনো তাঁরা ভারতীয় মহিলা দেখেননি। তারপর ভারতীয় মহিলাদের সৌন্দর্য্যের ও পরিচ্ছদাদির অনেক প্রশংসা করে, আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন যে, আপনারা—ভারতবাসী, বিদেশী হলেও আমাদের নিতান্ত পর ন'ন। যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতের সঙ্গে জাপানের ঘণিষ্ট সম্বন্ধ। আপনারা যদি দয়া করে একবার আমাদের দীন কুটীরে পদার্পণ করেন, তাহলে তবে আমাদের পরিবারের সকলেই আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হবে এবং আমাদের গৃহটিও পবিত্র হবে।

তাঁদের নিমন্ত্রণ আমরা সানন্দে গ্রহণ করলাম এবং সকলে মিলে ট্রামে চড়ে আসাকুশা অঞ্চলে তাঁদের গৃহাভিমুখে চল্লাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, বৈদ্যুতিক আলোক মালায় সমস্ত তোকিও সহরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিচিত্র বেশে জাপানী নর-নারী দলে দলে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে—আমাদের চোখে তা' অপরূপ ঠেকছিল। সেদিন তাদের চোখে মুখে যে আনন্দের দীপ্তি দেখেছি, এদেশে বড় একটা তা দেখা যায় না। ট্রাম থেকে নেমে সাত আট মিনিট হেঁটে আমরা সুমিমতোদের নব-নির্ম্মিত গৃহদ্বারে পৌছলাম।

আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে সুমিমতো-দম্পতি গৃহে প্রবেশ করলেন। ফটক খুলেই আমরা একটি হলে ঢুকলাম। আমার স্বামী তাঁর টুপি ও লাঠি সেখানে রাখলেন? তারপর আমরা সকলে জুতো খুলে রেখে সম্মুখের বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম। জাপানে ফটকের সঙ্গে একটি ঘণ্টা বাঁধা থাকে—

তাই ফটক খুল্‌লেই ঘণ্টার শব্দ হয়। আমরা হলে ঢুক্‌তেই পাশের ঘর থেকে দু'টি মেয়ে বের হয়ে এসেছিল, তারাও মায়ের ইঙ্গিতে আমাদের পিছু পিছু বস্‌বার ঘরে এলো; হটাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের দেখে মেয়ে দু'টি বিস্মিত হয়েছিল খুব। সুমিমতোসান্‌ তাদের বল্‌লেন,—
—এঁরা ভারতবাসী,—জাপানে বেড়াতে এসেছেন, সৌভাগ্য ক্রমে উয়েনো পার্কে দেখা হলো, তাই অনুরোধ করে নিয়ে এলাম। তোমরা এঁদের সঙ্গে আলাপ করে খুসী হবে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক খবরও জান্‌তে পারবে।

মেয়ে দু'টি তখনই মাদুর আটা মেঝের উপরে হাঁটু গেড়ে বসে আ-ভূমি মাথা নীচু করে বার বার আমাদের নমস্কার কর্‌লো—আমরাও যথা সাধ্য তাদের অনুকরণ করলাম।

যে ঘরে আমরা বসেছিলাম সে ঘরখানি আয়তনে বেশ বড় এবং প্রয়োজন হ'লে তিন দিকের কাগজের দেওয়াল সড়িয়ে সাড়া বাড়ীময় একখানি প্রকাণ্ড ঘরে পরিণত করা চলে। আসবাব পত্র তাতে বিশেষ কিছুই দেখলাম না, তবে. দেয়ালে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো ছিল।

সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মাদুর বিছানো ঘরের মেঝেতেই সকলে বসে পড়লাম। আমরা দু'জনে আমাদের দেশী প্রথা মতো—কিন্তু তারা সকলেই হাঁটু গেড়ে বসলেন। সুমিমতোসান্‌ মেয়ে দু'টিকে দেখিয়ে বললেন এরা দু'টি তাদের কন্যা—ওকুমিসান্‌ ও ওহানাসান্‌, বড়টির. বয়স উনিশ—হাস্‌পাতালে ধাত্রীর কাজ শেখে, আর ছোটটির বয়স পনেরো—স্কুলে পড়ে। সকলের বড় একটি পুত্র, বয়েস প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। জাহাজের

ইঞ্জিনিয়ার। আরও একটি পুত্র ছিল, বেঁচে থাকলে আজ চব্বিশ বৎসরের হতো। গত মহাযুদ্ধে সে দেশের জন্য কাউচাউয়ে জার্ম্মানদের হাতে জীবন দিয়েছে। সুমিমতো পত্নী ইতিমধ্যে কক্ষান্তরে গিয়াছিলেন। অবিলম্বে আরও একটি মহিলার সঙ্গে একটি খোকার হাত ধরে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নবাগতা মহিলাটি তাঁর পুত্র বধূ—নাম ওছুঙ্গিসান্, আর খোকাটি পৌত্র—নাম, তারো। আবার উভয় পক্ষেই নমস্কারাদি হ'ল। বধূটির বয়স অনুমান তেইশ, চব্বিশ। জাপানীদের সৌন্দর্য্যের বিচার করা আমাদের পক্ষে কঠিন। আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধের মাপ কাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে জাপানীদের—শুধু জাপানীদের কেন, সমস্ত মোঙ্গলিয়ান্ জাতিরই নাক চোখের খুঁত ধরা যেতে পারে। তথাপি এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জাপানে অনেক মহিলার মুখেই বেশ একটা লাবণ্য দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, তাদের স্বাস্থ্য যেমন চমৎকার, জীবনে আনন্দও তেমনি প্রচুর।

সুমিমতোসান্, আমাদের পরিচয় নিয়ে বললেন—যে তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরে ঐ আশাকুসা অঞ্চলে ডাক্তারী করছেন। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে তাঁর পশার বেশ ভালই ছিল। তখন এই বাড়ী ও দু'তিনটি যৌথ কারবারের অংশ ক্রয় করেছিলেন। কারবারে লাভও হ'ত, কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে তা প্রায় সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। বর্ত্তমানে কিন্তু কাজ তাঁর কিছুমাত্র কমেনি; তবে আয় যথেষ্ট কমেছে। কাজেই জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও ব্যয় সংক্ষেপ করতে হচ্ছে। এই অবস্থা তাঁর একার হলে, একথা তোলবার প্রয়োজন ছিলনা; কিন্তু প্রায় সকলেরি এই সমস্যা।

তাই তাঁর অনুরোধ, আমরা জাপান ভ্রমণকালে যখনি যাঁর সংস্পর্শে আসিনা কেন, জাপানীদের আতিথেয়তার ত্রুটী দেখলে তা' তাদের জাতীয় স্বভাব বলে যেন মনে না করি ; বরং একটি দুঃস্থ জাতীর দীনতা ও অক্ষমতা বলেই যেন তা ক্ষমা করি।

আমাদের এই সকল কথা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আরও একটি মহিলা ট্রে-তে করে চায়ের সরঞ্জাম এনে, গৃহিনীর সম্মুখে অনুচ্চ একখানি ছোট টেবিলের উপর রেখে, যথারীতি নমস্কার করে প্রস্থান করলো। জাপানে ভদ্রমহিলা ও পরিচারিকাদের চেহারা ও পরিচ্ছদের যেটুকু পার্থক্য, তাতে তাদের প্রকৃত পরিচয় অনুমান করা অনভ্যস্ত বিদেশীর পক্ষে সহজ নয়। ওদেশের পরিচারিকাদের পরিচ্ছন্নতার কাছে আমাদের ঝি-দের তো দূরের কথা, শুচিবায়ুগ্রস্থা গৃহিনীদের পরিচ্ছন্নতাও পরাজয় মানে।

চা তৈরী হলে সুমিমতো-গৃহিনী সর্ব্বাগ্রে আমাদের পরিবেশন করে পরে একে একে পরিবারস্থ সকলকে দিলেন। এই চা এবং "ওকাশী" (জাপানী পিঠে) দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে ওদেশে একই পরিবারের পরিজনদিগের মধ্যে কিরূপ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শিষ্টাচার বিরাজ করে তার পরিচয় সেই প্রথম পেলাম। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পরে আরও পেয়েছি এবং যখনি এই দৃশ্য দেখেছি, তখনি মুগ্ধ হয়ে রয়েছি। তাই দেশে ফিরে অবধি যখনি কোনও পরিবারের সংস্পর্শে আসি, তখনি জাপানী পরিবারের মতো শৃঙ্খলা, তৃপ্তি, শিষ্টাচার ও সদা-সতর্ক পরিচ্ছন্নতার অন্বেষন করি।

আজ ভাই এ'খানেই থাক, এক্ষুনি স্কুলের গাড়ী এসে পড়বে। ভালবাসা নিস্। ইতি—

রাণু।

— তিন —

১৪ ডিসেম্বর।

ভাই মিনি,

তোর ন তারিখের চিঠি পড়্‌লাম। তুই লিখেছিস, যতই সেই জাপান-ফেরতা মহিলাটির কথা শুন্‌ছিস্‌, ততই আমার প্রতি তোর হিংসে হচ্ছে—আর শেষ অবধি জানবার আগ্রহ ও বাড়্‌ছে। কিন্তু অত অধৈর্য্য হলে চল্‌বে কেন ভাই! আমি তো আগেই বলে রেখেছি যে দু' এক চিঠিতে সব শেষ হবে না। তবে যতটুকু যেমন মনে আসে ক্রমশঃ লিখবো, তার জন্য তোকে অত কোরে অনুরোধ কর্‌তে হবে না।

তিনি বললেন—জাপানীরা যেমন সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সে দেশের বাড়ী ঘর, রাস্তা-ঘাটও তেমনি—কোথাও অপরিচ্ছন্নতার চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সৌন্দর্য্য প্রিয়তা জাপানের সর্ব্বশ্রেণীর নর-নারীরই মজ্জাগত। বনে জঙ্গলে কোথাও সামান্য দু'একটি ফুল ফুটেছে জান্‌তে পারলে দলে দলে লোক তা' দেখ্‌তে ছোটে, কিন্তু কেউ তা' ছিঁড়ে নেয় না। তারা বলে,—ভগবানের এমন একটি দান সকলেরই উপভোগ্য—কারও একার জন্য নয়। এই সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা তাদের দৈনন্দিন জীবনেও বেশ পরিস্ফুট। গৃহ-প্রাঙ্গনের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা গৃহিণী

ও পরিবারবর্গের যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, তার সহজ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করাও তেমনি। কাজেই, দেখেছি যে সাধারণ গৃহস্থের বধূও তার সঙ্কীর্ণ অবসরটুকু প্রায়ই গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক কোন কাজে ব্যয় করেন। আমাদের সঙ্গে জাপানীদের যে ভীষণ পার্থক্য তার প্রধান কারণ—জীবনটাকে তারা আমাদের মত একটা মিথ্যা মায়া বলে বিশ্বাস করে না, তাই জীবনের দিনগুলি চোখ্ কান বুজে কাটিয়ে কোন এক অজ্ঞাত লোকে চলে যেতেও তারা ব্যস্ত নয়। জীবনে তারা সুখ, সমৃদ্ধি ও যশ চায় এবং তার মূল্য দিতে অর্থাৎ সেজন্য সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে শ্রম করতে সততই প্রস্তুত।

—জাপানের কোন সহরে কোন রাস্তার উপরেই কথনো নোংরা কিছু পড়ে থাকতে দেখিনি, গৃহ সম্মুখে অপরিচ্ছন্নতা কেউ তারা সহ্য করে না। সহরের প্রতি অংশের প্রত্যেক নর-নারীই নিজেদের পল্লী সম্বন্ধে একটা বিশেষ গর্ব্বানুভব করে। অন্য পল্লীর তুলনায় তাদের পল্লী নিকৃষ্ট বিবেচিত হবে, সে জায়গার স্বাস্থ্য খারাপ হবে, এ-তারা কেউ সহ্য করতে পারে না। সেজন্য জাপানে রাস্তায় চলতে গেলে উপর থেকে ঘর ঝাট দেওয়া ধূলো কিম্বা তার চেয়েও নোংরা কোন কিছু গায়ে এসে পড়বার আশঙ্কা নেই। বিশেষতঃ রোগী পরিত্যক্ত নিষ্টিবন ইত্যাদি রাস্তায় ফেলে রোগ সংক্রামিত করে; পরে তারা তাকে অদৃষ্টের দোষ বলে আপশোষ করে না। আসল কথা, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের এহেন ঐকান্তিক চেষ্টাই যে জাপানের স্বাস্থ্য এতদূর উন্নত করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

তিনি আরও বলেন,—এদেশে আজকাল সকলের সুখের "অধিকার অধিকার" বলে একটা রব উঠেছে। চিরবঞ্চিতের

এই অধৈর্য্য, এই অধিকার উন্মত্ততা অস্বাভাবিক নয় বটে, তবে কিনা এ'তেই তো আর অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। তারজন্য আরও কিছু দরকার। আমাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করাই যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তা হলে এই উন্মাদনা অতিক্রম করে শান্ত সমাহিত চিত্তে ভেবে দেখতে হবে কি কি অধিকারে আমরা বঞ্চিত এবং তার কতটা থেকে নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করেছি, আর বিদেশী শাসক সম্প্রদায় দ্বারাই বা কতটা বঞ্চিত হয়েছি। বহু যুগ ধরে সমাজ, ধর্ম্ম ও দেশাচারের নামে যে সকল মনুষ্যোচিত অধিকার থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা বঞ্চিত হয়ে আস্‌ছি, তা অর্জ্জন করবার একাগ্র বাসনা আজও যদি আমাদের প্রাণে না জেগে থাকে, তবে স্বরাজ স্বরাজ বলে এই হট্টগোল নিতান্ত বাতুলতা বলে মনে হয়। যতদিন গোড়ায় গলদ ঢাকা থাকবে ততদিন কোন যাদু মন্ত্রে স্বরাজ লাভ হবে না, তার জন্য সাধনা চাই, ত্যাগস্বীকার চাই। অনুন্নতকে উন্নত করতে হবে, ছোটকে বড় করতে হবে—যার ভিতর যে শক্তি আছে তা বিকাশের সুযোগ দিলে তবেই জাতীয় শক্তি বাড়বে।

জাপান থেকে ফিরে এসে অবধি এই যে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, মাঠে, ঘাটে রেলে, ষ্টীমারে সর্ব্বত্র ম্রীয়মান, উৎসাহ আনন্দহীন মুখগুলি দেখে—দুঃস্থ বঞ্চিতের সংখ্যা দেখে—কেবলি মনে জেগে উঠে যে আমাদের পুরুষানুক্রত পাপ রশির প্রায়শ্চিত্ত এখনো অনেক বাকী রয়েছে—বাকী রয়েছে বলেই আজও কোটী কোটী নর-নারীর স্বদেশ প্রেম অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

যে পাপে ভারতের বিপুল শক্তি শিথিল ও বিক্ষিপ্ত, সে পাপ স্খালন না কর্‌লে শক্তি আসবে কোথা থেকে? ছোটকে বড় কোরে নাও—মনে প্রাণে বলো ভারতের কেউ আর অস্পৃশ্য নয়—সবই ভারতের সন্তান। সকলের মূল্য—সকলের অধিকার যে দিন সমান হবে—সবার কর্ত্তব্যও সে দিন সমান হবে।

বর্ত্তমান জগতে স্বাধীনতার নায্য মূল্য সংগ্রহ না করে' তা দাবী কর্‌তে গেলে দুনিয়ার আসরে হাস্যাস্পদ হতে হয়। ন্যায়ের যুক্তিতে, ধর্ম্মের কথায় কোনও ফল হয় না; এই তথ্যটি জাপানীরা ঠিক সময়ে বুঝেছিল বলেই এত বড় হতে পেরেছে। তথাপি এখনো তাদের স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকেই ভাবে, আমি জন্মে আমার দেশের কি কাজে লাগলাম, আমাকে দিয়ে সমাজ ও জাতীর কি উপকার হ'ল বা হবে? আমিও ত এই দেশের সন্তান—সন্তানের যোগ্য কাজ কি করেছি. কি করছি—আর তা না করতে পারলে জীবনে শান্তি, সার্থকতা ও গৌরব কোথায়?

জাপানীরা স্বাধীন জাতি বটে তথাপি মার্কিনও ফরাসী প্রভৃতির তুলনায় আজও অনেক অধিকারেই বঞ্চিত। সে জন্য তারা চেঁচিয়ে বেড়ায় না, তারা জানে শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, শক্তি, সাহস, আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি প্রভৃতি যে সকল গুণের অভাবে পরাধীনতা বা অধিকার চ্যুতি ঘটে, একে একে তা' দূর কর্‌লেই আকাঙ্খিত অধিকার লাভ করা যায়। কেন না, যোগ্য ব্যক্তি বা জাতিকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে কখনো বেশীদিন বঞ্চিত করে' রাখা সম্ভব নয়। হাঁ, অনেকেই বলে থাকেন বটে যে জাপান স্বাধীন

দেশ, তার সঙ্গে ভারতের তুলনা করাই ভুল। কিন্তু পরাধীন হলে কি কর্ত্তব্য করা চলে না—উন্নতির পথে চলা যায় না? তাই যদি হ'ত, তবে যে জাতি অনুন্নত, পরাধীন, সে চিরদিন অনুন্নত, পরাধীনই থেকে যেতো—তার উদ্ধারের কোন আশাই থাক্‌তো না।

স্বাধীন হলেই যে জাতি উন্নত হয় তা' নয়। চীন, পারস্য, শ্যাম প্রভৃতি দেশ স্বাধীন বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা এমন নয়, যা' দেখে পরাধীন ভারতেরও ইর্ষার উদ্রেক হতে পারে। এ যুগে অবশ্যি কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে।

ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে জাপানেও অনেক গলদ ছিল। তখন তারাও এসিয়ার অন্যান্য জাতির মতোই আত্ম গরিমায় বিভোর হয়ে বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে আস্‌তে নারাজ ছিল। কিন্তু সেই অজানা জগতের অবাঞ্ছিত লোক, জাপানীদের নিষেধ না মেনে, দম্ভভরে যখন জাপানের রুদ্ধ দ্বার ভেঙ্গে তাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ কর্‌লো, তখন সেই দেশব্যাপী শোকোচ্ছাস এবং ক্রোধোন্মত্ততার মধ্যেও এমন কয়েক জন সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষ সে দেশে ছিলেন, যাঁরা ঐ বিপদের বার্ত্তবাহি বিদেশীদিগের অন্তরালেই আবার মুক্তির ইঙ্গিতও দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তারা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন—'যে মন্ত্রে, যে দীক্ষায় এই বিদেশীগণ শক্তিমান হয়ে দিগ্বিজয়ে বের হয়েছে, সেই মন্ত্র, সেই দীক্ষা, লাভ কর্‌তে না পারলে পরিত্রাণের অন্য পন্থা নেই।' ফলে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যখন সেই নব জ্ঞান-লব্ধ মুক্তির পথে অগ্রসর হন, যখন ঐ পথে

সকলকে আহ্বান করেন—তখন কত না বিদ্রূপ, ধীক্কার, কুৎসা—এমন কি গুরুজনের ভৎসনা, ধার্ম্মিকের অভিশাপ,সমাজের নির্য্যাতন সমস্তই তাঁদের সহ্য কর্তে হয়েছিল। তবুও সেই মুষ্টিমেয় দেশ-প্রাণ দেশ সেবকগণ বিচলিত হন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন, দেশ ও জাতির দুরবস্থা অনুভব করবার শক্তি ভগবান যাদের দিয়েছেন'—মুক্তির নির্দ্দেশ যাদের কাছে করেছেন—তমসাছন্ন সেইজাতির উদ্ধারের গুরুভার এক মাত্র তাদেরই উপর। অধিকন্তু জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে জীবন ব্যাপী কঠোর সাধনায় যারা প্রবৃত্ত, স্বদেশ সেবার অশেষ ক্লেশ ও অপার তৃপ্তির তারাই তো শুধু অধিকারী। এই অনুপ্রেরণায় তাঁরা শত বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা ও প্রচালিত কু-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সে দিন মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীগণ বিদেশী ভাবাপন্ন বলে দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ভেবে প্রাণপণে যাঁদের নির্য্যাতন করেছিল, তাঁরাই আজ জাপানের ঘরে ঘরে অন্তরে অন্তরে পূজিত কেন না, তাঁদের ঐকান্তিক সাধনার ফলেই জাপান আজ মুক্তির আলোকে আলোকিত—জ্ঞানে, গুণে, শক্তিতে জগতে সম্মানিত।

তারপর মিসেস্ রায় জানালেন—ইদানীং অনেকেরই ধারনা জন্মেছে যে বিদেশী সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করে জেলে যাওয়াই দেশ সেবার চরম পন্থা। কিন্তু যাঁরা সারাটা জীবন দুঃখ দারিদ্র ও নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে—লোকের হাসি টিট্কারী অগ্রাহ্য করে জাতীর কল্যাণ-কর

কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন,—নিজের পুণ্য বলে আরও পাঁচ-জনকে অনুপ্রানিত করে মহত্বের সাধনায় নিযুক্ত করচেন, তাঁদের দেশ প্রেমও তো অস্বীকার কর্‌তে পারি না। জেলে যাওয়ার সাহস ও ক্লেশ সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নেই, এবং অবস্থা বিশেষে জেলে যেতে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সব অবস্থায় সেইটাই বড় কাজ এরূপ মনে করাও ভুল।

ভারতের বিক্ষিপ্ত ও অবজ্ঞাত জনসঙ্ঘকে একতা সূত্রে বাঁধতে পারলে যে শক্তির উদ্ভব হবে, সমগ্র জগতে তার তুলনা নেই। একতা আন্‌তে হলে আমাদের সকল দাবী, সকল উদ্যম, সমস্ত কামনা জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর কল্যানার্থ নিয়োজিত করতে হবে—একথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তে হবে যে, ছোট যত দিন ছোটই থাক্‌বে জাতি ততদিন সুস্থ সবল হতে পার্‌বে না। কারণ ছোট বলে আজ যাঁরা অবজ্ঞাত, তারাই না জাতির মেরুদণ্ড! আমাদের যা কিছু সুযোগ বা অধিকার আছে তার অংশ দিয়ে ছোটকে বড় করে নিলে তবেই তারও আত্ম মর্য্যাদা আস্‌বে, তারও স্বদেশ প্রেম জাগবে, কারণ সেও তো মানুষ—বড় হওয়ার অধিকারী!

"জাপানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমাদের দেশে রাজা রামমোহন, দয়ানন্দ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতি কখনো জেলে যাননি, কিন্তু বীরত্বের ও একনিষ্ঠ স্বদেশ প্রীতির যে পরিচয় তাঁরা দিয়ে গিয়াছেন, তাতেই না আজ ভারতের ঘোর তমসা এতটা কেটে গিয়েছে—তাতেই না এদেশে আজ জাতি গঠনের

সূত্রপাত ও স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্তি। কিন্তু বহু শতাব্দী সঞ্চিত পুঞ্জীভূত পাপ পঙ্কিলতা অধিকাংশই যে এখনো রয়ে গিয়েছে এবং তাতেই না আমাদের বহু কল্যাণ-চেষ্টা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত ও ব্যর্থ হয়ে চলেছে। এখনো অস্পৃশ্যতা, বাল্য বিবাহ, পণ-প্রথা চলেছে! এদেশে এখনো প্রবঞ্চনা বা পুরুষের চরিত্রহীনতার জন্য জাতিচ্যুতি ঘটে না,—কিন্তু বিদেশ গমনে ঘটে। এখনো ব্রাহ্মন অতি জঘন্য জীবন যাপন করেও তার ব্রাহ্মনত্ব হারায় না, অথচ কোন অব্রাহ্মন আমরন আদর্শ জীবন যাপন করে—শত-মহৎ কাজ করেও ব্রাহ্মনত্ব লাভ করে না। স্বাধীনতা লাভে অধৈর্য্য আমরা—অবনত মস্তকে এই সকল অসঙ্গত ব্যবস্থা মেনে চলেছি। জেলে যেতে সর্ব্বদাই যারা প্রস্তুত, তারাও বাল্যবিবাহ ও পণ প্রথার সমর্থন করছেন। সমাজের এই সকল পাপ দূর করতে, জাতীয় দুর্ব্বলতার এই সকল উৎস্য রুদ্ধ করে দিতে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, আর ইংরেজও এতে বাধা দিতে পারে না। শুধু ঐকান্তিক চেষ্টার অভাবেই আমরা তা করে উঠতে পারিনে। তারই ফলে প্রকৃতি দেবীর অজস্র দান সত্ত্বেও আমরা মহা দরিদ্র-বহু শক্তি থাকৃতেও নিতান্ত অসহায়—দুর্ব্বল।”

তার মুখে শুনেছি,—জাপানে অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই কোন না কোন নারী-সমিতিসভ্যা। তাদের উদ্দেশ্য পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষাও স্বাস্থের উন্নতি, বিপন্নের সহায়তা, সৎ-জ্ঞানের প্রচার করা ইত্যাদি। এই সকল নারী সমিতির চেষ্টায়, সহরের কোন অঞ্চলেই, ব্যবসায়ীর পক্ষে ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করাও যেমন

অসম্ভব ;—সংক্রামক ব্যাধি গ্রস্ত লোকের পক্ষে ভিক্ষার অজুহাতে সর্ব্বত্র যাতায়াত দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাধি বিস্তার করাও তেমনি দুরূহ।

দুঃস্থের প্রতি তাদের যথেষ্ট দয়া আছে বটে, কিন্তু সুস্থের জীবন বিপন্ন করে তারা যে দয়া প্রকাশ করে না। তাই কুষ্ঠ বা অন্যান্য দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ লোকদিগকে জাপানের বিভিন্ন প্রদেশ হতে দলে দলে আসতে দিয়ে তোকিও কি ওসাকার জনাকীর্ণ রাস্তায় চলে বেড়াতে দেওয়া হয় না। এই প্রকারের দুঃস্থদিগের প্রতি জাপানীদের দয়া আছে কিন্তু সে দয়াও বিচারবুদ্ধি পরিচালিত ; কাজেই দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থদিগকে ঈশ্বরের গুপ্তচর বলে বিশ্বাস করে জাপানীরা ভীত বা অতিরিক্ত করুণা পরবশ হয় না, বা উহাদের সংস্পর্শে সর্ব্ব সাধারণের যে বিপদ, তাও বিস্মৃত হয় না। তাদের জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়,—উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানেই তারা রোগী হিসেবে বসবাস করে।

মাসিক সামান্য চাঁদা তুলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে সমষ্টিবদ্ধ করে কত কল্যাণকর, কত বৃহৎ কাজ যে হতে পারে জাপানে তার জাজ্বল্যমান প্রমান দেখা যায়। সে দৃষ্টান্ত যে দেখেছে তার প্রাণে আর কোন নৈরাশ্যই থাকতে পারে না ; কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন, অর্থ বা অন্য কিছুর অভাব কোনও জাতীর উন্নতি বা স্বাধীনতার অন্তবায় হতে পারে না—একনিষ্ঠ সাধনার অভাবই তার একমাত্র অন্তরায়।

আজকের মত এই থাক্। দেখ্লি তো, এবার কত বড় চিঠি তোকে লিখলাম। এখন তোর ভাল লাগলে হয়। একটী সুসংবাদ শেষের জন্য রেখেছি। কাল মিঃ ও মিসেস্ রায় চাঁদপুর মেলে এখানে এসে পৌঁছবেন। আমিও বাবার সঙ্গে ষ্টেশনে যাব তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে। তারপর তিন চার দিন অনেক কথাই শোনা যাবে এবং জাপানের সুন্দর সুন্দর ছবিগুলোও আর একবার দেখতে পাবো।—কিরে, তোর বুঝি হিংসে হচ্ছে,—না? তা তুই ভাল ভাল সিনেমা দেখে তার শোধ নিশ্—হিংসে করিস্‌নে যেন। আশাকরি তোরা ভাল আছিস্। ভালবাসা নিস্। ইতি—

তোর—রানু—

— চার —

গেণ্ডেরিয়া—

২৪শে ডিসেম্বর।

ভাই মিনি,—

আগের চিঠিতেই তোকে লিখেছি মিঃ ও মিসেস্ রায় তিন চার দিনের জন্য অতিথি হয়ে আমাদের বাড়ী আস্‌ছেন। তাঁরা এসেছিলেন ঠিকই, তবে একদিনের বেশী থাকেননি। কিন্তু ঐ একটি দিনই তাদের নিয়ে যে কি আমোদে কেটেছে,

তা' আর কি বলব ! আরো দু'দিন থাকতে তাঁরা রাজী ছিলেন ; কিন্তু পরদিন ভোরে চা' খেতে বসে বল্লেন,—সেদিনই মেলে কলিকাতা যেতে হবে তাঁদের। তারপর জিনিষ পত্র গুছিয়ে, খাওয়া দাওয়া সেরে, সত্যি সত্যি তাঁরা চলে গেলেন। আমার অত অনুনয়—অনুরোধ কিছুতেই কিছু হয়নি। তাঁদের এই হঠাৎ চলে যাওয়ায় মনে যে কি কষ্ট পেয়েছি, তা' আর কি বলবো। কত কথা জিজ্ঞেস করবো, কত গল্প শুনবো, আরো কত কি আশা করেছিলেম—তা আর কিছুই হলো না ; একটি দিন দেখতে দেখ্‌তেই কেটে গেল। সব সময় তাঁদের সঙ্গে থেকে যে কত আনন্দ পেয়েছিলাম, সে কথা তুই বুঝবিনে। এখন মনে হচ্চে—ঐ একটি দিন যেন একটি নিমেষই শুধু। কিযে চমৎকার মেয়ে তিনি তা' তাঁকে ভাল করে না জান্‌লে বোঝবার যো নেই। তিনি আমার চেয়ে কত বড় আর কত শিক্ষিতা—তার ওপর অবার কত দেশ বিদেশ বেড়িয়ে এসেছেন, কিন্তু তা বলে এতটুকুও অহঙ্কার নেই। একটি দিনের মধ্যেই তিনি আমাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছেন। এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার মাসিমা পাতান হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে যে কেবল একটি দিনের জন্য, কে তা' আগে জানতো ? এখনো কিন্তু তা বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে।

আমি তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিন্তু বলেন-নি। শুনলাম, বিশেষ আপত্তি আছে। চলে যাওয়ার সময় ঠিকানা চেয়েছিলাম-তাও দিলেন না,বল্লেন, অত মায়া বাড়ান কি ভালো ? তা' ছাড়া তাঁদের নাকি থাক্‌বার নির্দ্দিষ্ট কোনও স্থান নেই।

কলিকাতা গিয়ে কোনও একটা হোটেলে উঠবেন, তারপর আরো কোথায় কোথায় যাবেন, কাজেই আমি আর কিছুই বল্‌তে পারি নি।

ষ্টেসনে গাড়ীতে ওঠ্‌বার সময় তাঁকে নমস্কার করতেই আমাকে বুকে চেপে ধরে অতি করুণ স্বরে তিনি বল্লেন—আমি যেন তাঁদের কথা ভেবে মনে কোন কষ্ট না পাই—মন দিয়ে যেন লেখা পড়া করি এবং জাপানীদের দেশ সেবার যে-সব কাহিনী তিনি বলেছেন, তা' যেন ভুলে না যাই। আমার প্রতি তাঁর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ, দেশের সেবা ও জাতীয় উন্নতির চেষ্টাই যেন আমার জীবনের ব্রত হয়। তারপর খানিকটা থেমে আবার বল্লেন,—যাদের অন্তরে সহানুভূতি ও উদারতার মহাসম্পদ রয়েছে, জাতীয় দুষ্কৃতির প্রায়-শ্চিত্ত করবার তারাই তো শুধু অধিকারী। তোমাকেও ভগবান সে-সম্পদ দিয়েছেন, বড় হয়ে তুমি তার অপব্যবহার করো না।

কেন জানি না ভাই তাঁর কথা শুনে আমার চোখে জল এসে-ছিল, মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আমার কত বড় আপনার —যেন সত্যি কারেরই মাসিমা। তাই যদি হতো!– তা' হলে তো আর এম্নি করে তিনি চলে যেতে পারতেন না। মার কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু বড় হয়ে অবধি আমার উপর এমন ভালবাসা, এমন কল্যাণ-কামনা আর কারো কাছেই পাইনি। বাবার স্নেহ, যত্ন, ভালবাসাই এতদিন আমার যথেষ্ট মনে হয়েছে; কিন্তু এখন যেন—থাক্ ভাই, দুঃখের কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

মাসিমার নাম—নিষ্কৃতি দেবী। বয়স হয়তো চব্বিশ বৎসরের

বেশী নয়,—খুব ফর্শা—দেখতে খুব সুন্দর। সব চেয়ে চমৎকার তাঁর দু'টি চোখ। কিন্তু কেন জানিনা, তাঁর মুখ খানিতে বিষাদের ছায়া যেন লেগেই আছে। তাই একটু হাস্‌লেই তাঁকে ভারি সুন্দর দেখায়। মেসো মহাশয়ের নাম—মিঃ বি, রায়। বাবার বয়সী হবেন হয়তো, চল্লিশের বেশী বলে মনে হয় না। ইনিও দেখতে ভালই তা বলে মাসিমার মত অত সুন্দর নয়। তা ছাড়া যেন একটু গম্ভীর। ইনি এশিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশ ঘুরে এসেছেন। খুব বিদ্বানও নাকি—বাবা বলেছিলেন।

ভেবেছিলাম, এবার তাঁদের কাছে জাপানের অনেক খবরই জানতে পারবো—তা হলো না। কে জান্‌তো এমনি করে হঠাৎ তাঁরা চলে যাবেন! তবু যতটুকু জানতে পেরেছি ক্রমে তোকে লিখ্‌বো, তবে সে খুব বেশী নয়।

মাসিমা বলেছিলেন যে সুমিমতোদের সঙ্গে আলাপ হবার পর তাঁদের বাড়ী যাতায়াত তাঁদের প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুদিন না গেলেই সুমিমতোদের কেউনা কেউ মাসীমাদের হোটেলে এসে তাঁদের গ্রেপ্তার করে আসাকুসায় নিয়ে যেতেন। ক্রমে তাঁদের বাড়ীতে কখনও কখনও দুপুর বেলায় আহারের ব্যবস্থা হতো—তারপর সারাটা দিনও কাটাতে হতো তাঁদের সঙ্গে—ওরা কিছুতেই ছাড়তেন না। তোকিওর প্রসিদ্ধ উদ্যান, মন্দির, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, আশ্রম, কারখানা প্রভৃতি দেখে বেড়াবার পালা সুরু হয় এমনি করেই।

মাসীমা বলছিলেন,—সব খানেই আমরা যে-সমাদর যে সম্ভ্রম

পেয়েছি, তা' জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না। তা' ছাড়া স্থমিমতোদের সঙ্গ-ফলে তোকিওর বহু গণ্য মান্য প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। অনেকের বাড়ীতে চা পান এবং কারো কারো গৃহে সায়াহ্নভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি। জাপানী নারীদের সযত্ন প্রস্তুত খাদ্য সম্ভার আমাদের অনভ্যস্ত রসনার পক্ষে তৃপ্তিকর না হলেও, ঐ অতিথি-পরায়ন জাপানীদের আদর যত্নে, তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ আলোচনায়, এবং সর্ব্বোপরি কয়েক জন বিশিষ্ট জাপানীর পারিবারিক জীবনের সাক্ষাৎ পরিচয়ে আমরা পরম প্রীতি লাভ করেছি। জাপান ভ্রমন কালে, আমরা যে কেবল তোকিও, কামাকুরা,নিক্কো, কিওতোর, ফুজিয়ামা প্রভৃতি স্থানের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলীই দেখেছি তা নয়; পরন্তু জাপানীদের দৈনন্দিন জীবনের এমন অনেক দৃশ্য দেখেছি যার সৌন্দর্য্য আমাদের মত' আত্ম-বিস্মৃত জাতীর পক্ষে, প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভার চেয়ে:কম উপভোগ্য নয়।

তারা প্রথম যে দিন নিমন্ত্রিত হয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য স্থমি-মতোদের বাড়ী যান, সেইদিনই আহারাদির পর সকলে উপরের একটা ঘরে বসে চীন জাপান ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সেই অবসরে স্থমিমতোর নাতিটি সকলের অলক্ষে তার মায়ের সেলায়ের সাজি থেকে রেসমী স্থতোর একদিক নিজের আঙ্গুলে জড়িয়ে বল্‌টি জানালা গলিয়ে নিচে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করছিল, হঠাৎ তার মার দৃষ্টি সেদিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়

তিনি বলে উঠলেন, তারোসান্, ওটা নিয়ে আমার কাছে একটি বার এসো।

তারেসান তখনই মার দিকে একবার ফিরে তাকালো বটে কিন্তু বল নিক্ষেপের অভিপ্রায় ত্যাগ কর্ব্বার ইচ্ছা তার বিশেষ দেখা গেল না।

মা পুনরায় ডাক্‌লেন—তারো!

তারো কিন্তু এবার মার দিকে দৃষ্টিপাত-ও করলো না, মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মা তখন ক্ষুন্ন স্বরে বল্লেন—বেশ তারোসান, আজ থেকে তুমি আর তোমার মার কথা শুনো না। নিজের যা ভালো লাগে তাই করো—সেই ভালো বুঝলে!

একটু পরেই কিন্তু ছেলে ধীরে ধীরে মায়ের খুব কাছে এসে আস্তে ডাক্‌লো—মা।

মা তখন সেলায়ে মন দিয়েছিলেন, মুখ তুলে একটিবারও চাইলেন না, কোনরূপ সাড়াও দিলেন না। ছেলে আবারও ডাক্‌লো। মা এবার তার ম্লান দৃষ্টি অপরাধী সন্তানের প্রতি স্থাপন করে বল্লেন—মাকে কেন তারো! তুমি তো আর তোমার এই দুষ্টু-মাটিকে ভালোবাস না।

এই নিদরুণ কথা শুনে শিশুর কোমল প্রাণে কঠিন আঘাত লাগলো—সে উচ্চরোলে কেঁদে উঠলো। মাত খন ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে বাস্পনিরুদ্ধ-কণ্ঠে বল্লেন—তুমি কি জান না তারো, ছেলে অবাধ্য হলে মার প্রাণে কত বড় আঘাত লাগে?

তারোসান তখনই তেমনি অশ্রু-উজ্জ্বল চোখে প্রতিজ্ঞা

করলো—সে আর কখনো মার অবাধ্য হবে না, আর কখনো তার প্রাণে আঘাত দিবে না। মা-ও সজল নয়নে প্রতিজ্ঞা করলেন, অন্যায় না করলে তিনিও কখনো আর তারোকে বক্‌বেন না

মাতা পুত্রে এইরূপে সন্ধি স্থাপিত হলো। বিনা-চড়ে বিনা চীৎকারে শুধু স্নেহ ও অভিমানের দ্বারা যে পার্ব্বটি শেষ হয়ে গেল—আমাদের দেশে তা যে অনেক বেশী আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হত, তা বলাই বাহুল্য। মাসীমা এই দৃশ্যটি নাকি সিনেমার ছবির মত দেখ্‌ছিলেন। মেসো-মসাই পরে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলেন, নইলে এমন মর্ম্মস্পর্শী একটি দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বোধে তিনি বঞ্চিত হতেন হয়তো।

তিনি দুঃখ করে বলছিলেন,—এর সঙ্গে আমাদের সন্তান 'মানুষ' কর্‌বার চিরন্তণ প্রণালীর তুলনা করাই ধৃষ্টতা। কারণ মানুষেই মানুষ গড়তে পারে, অন্যে তা পারে না। আমরা মানুষ গড়তে জানি না বলেই এদেশে সত্যিকারের মানুষের এত অভাব। তাই আমাদের সকল উদ্যম পণ্ড হয়ে যায়। জাপানও যতদিন প্রাচীন সংস্কারের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, স্বদেশীয় মোহে আচ্ছন্ন ছিল, ততদিন সেও এই সুচিন্তিত আধুনিক শাসন-প্রণালার-সন্ধান পায় নি। সে সন্ধান কেউ দিতে এলেও দেশদ্রোহী বলে তাকে ধীক্কার দিয়েছে। তারাও দেশের সেবা কর্‌তে গিয়ে আমাদেরই মত বদ্ধমুল ভ্রান্ত ধারণা ও চিরাভ্যস্ত কুপ্রথার বশবর্ত্তী হয়ে, জাতীয় কল্যাণকে—ভগবানের অশীর্ব্বাদকেই প্রত্যাখ্যান করতো; তাই জাপানের অবস্থা তখন অত হীন ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে তার

সেই মোহ ঘুচেছে, সেই দিন থেকে তার দুর্গতিরও অবসান হয়েছে। জাপানে তাই আজ অত মানুষের সমাবেশ, তাই সেদিনকার ক্ষুদ্র অসভ্য জাপান আজ জ্ঞানে, গুণে, বীর্য্যে এত বড়, জগতের সভ্য সমাজে সম্মানিত—আর আমাদের বিশাল ভারত!

আজ ভাই এখানেই শেষ করি। তাঁরা হঠাৎ চলে যাওয়ায় মনের অবস্থা ভাল নেই। তিন দিন থাকৃতে তাঁরা রাজী ছিলেন, কিন্তু আসবার পর দিনই কোন চিঠি বা টেলিগ্রাফ না পেয়েও কেন যে তাড়াহুড়ো করে কল্‌কাতায় চলে গেলেন, কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমার অত অনুনয়— অনুরোধ যখন বারে বারেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন এবং অন্য কথা বলে চাঁপা দিতে লাগ্‌লেন, তখন আমি বাবাকে বল্লাম আর একটি দিন থাকৃবার জন্য তাদের বল্‌তে, কিন্তু আশ্চর্য্য বাবা একটি কথাও বল্লেন না। পিসীমা যে অমন লোক, তিনিও কত বল্লেন; কিন্তু বাবার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না। বাবার এমন ব্যবহার আগে কখনো দেখিনি। যাক্‌ ভাই, সে সব ভেবে এখন আর কি হবে?

আশা করি তোরা ভাল আছিস্‌। উত্তর দিতে দেরী করিস্‌নে যেন। ইতি—

তোর রাণু।

—পাঁচ—

গেণ্ডেরিয়া

২রা জানুয়ারী।

ভাই মিনি,—

তোর চিঠি পড়্লাম। তুই অত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্ কেন? আমি মাসীমার কাছে জাপান সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছি সবই তোকে লিখবো। সুষমার চিঠিও পেয়েছি। সে লিখেছে, তোদের ওখানে একদিন বেড়াতে গিয়ে আমার চিঠিগুলি নাকি পড়ে এসেছে, আর তাকে আলাদা করে লিখিনি বলে অভিমানও করেছে। এমন বড় চিঠি ক'খানা ক'রে লেখা যায় বল্‌তো? এবার থেকে সব চিঠি গুলোই ওকে দেখাস—বুঝলি? কিন্তু দেখিস্—অন্য মেয়েরা যেন জান্‌তে না পারে, তাহ'লে কিন্তু ঠাট্টা করবে।

মাসীমা বল্‌ছিলেন,— প্রফেসার তাশিরোসানও তাঁর বাড়ীর আর সবাইর সঙ্গে সুমিমতোদের বাড়ীতেই তাঁদের আলাপ হয়। তাশিরোসান জাপানের খ্যাতনামা একজন অধ্যাপক এবং তার স্ত্রীও উঁচুদরের বিদুষী মহিলা। স্বামীর সঙ্গে ইনি ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক দিন কাটিয়ে এসেছেন। ওঁরা দু'জনেই ইংরাজী বেশ বল্‌তে পারেন। তা ছাড়া জার্ম্মেন ভাষাতেও নাকি বিষেষ অধিকার আছে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে

এদের ধারনা নিতান্তই কল্পনামূলক নয়। তাশিরো-গৃহিনী তোকিওর বৃহৎ অনাথ-আশ্রমের একজন উৎসাহী ও বিচক্ষণ কর্ম্মী।

মেসোমশাইকে একদিন ইয়াকোহামায় তাঁর এক শিল্পদেশীয় ব্যবসায়ী বন্ধুর বাড়ীতে একা নিমন্ত্রন রক্ষা করতে যেতে হয়। ফিরে আসতে রাত হবার সম্ভাবনা। সারাটাদিন মাসীমাকে একাকী চুপ্‌চাপ্‌ হোটেলে বসে' কাটাতে হবে জানতে পেরে তাশিরো-গৃহিনী তাঁকে নিজেদের বাড়ীতে দিবস যাপনের নিমন্ত্রণ করে পাঠান। সেদিন রবিবার, ভোরে চা খেয়ে মেসো-মশাই ইয়াকোহামায় রওনা হয়ে যান। তারপর বেলা নয়টার সময় তাশিরোসানের কন্যা ওনামিসান রিক্‌স করে মাসীমাকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে আসেন। তাদের বাড়ী কাছে বলে' বেশীক্ষণ যেতে লাগেনি। ছুটির দিন হলেও তাসিরোসান্‌ কিন্তু বাড়ী ছিলেন না। প্রবীণ অধ্যাপক 'দাইগক্কুর' (university) লাইব্রেরীতে অধ্যয়ণ করতে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য্য—জ্ঞানী ব্যক্তির অফুরন্ত জ্ঞান-তৃষ্ণা কিছুতেই বুঝি মেটে না।

তিনি বল্লেন,—তাশিরোদের সঙ্গে সেদিনটি যে শুধু আমোদেই কেটেছিল তা' নয়, পরন্তু শেখবার মতো অনেক কিছুই লক্ষ্য করে ছিলাম। তাশিরোসান বাড়ী ফিরে আসেন দুপুর বেলায়—তখনই জাপানে মধ্যাহ্নে ভোজনের সময়। সকলেই একসঙ্গে আহারে বস্‌লাম। টেবিলে ছুরি কাঁটার সাহায্যে খাওয়ার ব্যবস্থা—তাই বেঁচে গেলাম। কেননা জাপানীদের মতো কাঠি

দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস কিছুতেই করতে পারি-নি। পরে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে যখন মুরগীর 'কারী' এল, তখন সত্যি করেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তাশিরো গিন্নী বল্লেন—লণ্ডনে 'কারী' ভাত খেয়ে তাঁদের নাকি খুব ভাল লেগেছিল এবং এ-জিনিষটি ভারতীয় ডিস্ জান্‌তে পেরে, তিনি ওর পাক-প্রনালীও মোটামুটি শিখে এসেছিলেন। তবে তেমন ভাল করে তো আর শিখতে পারেন নি, হয়তো আমার কাছে ভাল লাগবে না। কিন্তু আমি রান্নার প্রশংসা করায় তার মনে খুসীর অন্ত ছিল না।

তাশিরোসান ভারতীয় সভ্যতার কথা, প্রাচীন ভারতের নিকট জগতের, বিশেষতঃ জাপানীদের ঋণের কথা তুলে অবশেষে বল্লেন,—কোনও জাতীর উত্থান বা পতন, উন্নতি বা অবনতি, কোন আকস্মিক ঘটনাতে সঙ্ঘটিত হয় না। আকস্মিক ঘটনায় অবশ্য কথনো কখনো জাতি বিশেষের উপকার বা অপকার হয় বটে। যেমন গত মহা-যুদ্ধে ইউরোপের কোন কোন পরাধীন জাতী নিজেদের উদ্যমে নয় বরং ঘটনাচক্রে স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে তারা পূর্ব্বেই জাতীয়তা অর্জ্জন করেছিল বলে ঐ সুযোগে স্বাধীনতা লাভ করে' তা বজায় রাখতে পেরেছে। পক্ষান্তরে গত ভূমিকম্পে জাপানের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু এ'রূপ আকস্মিক ঘটনার ফলাফল তো সচরাচর স্থায়ী হয় না। তুরস্কের অধীন এসিয়াটিক্ জাতীগুলো কিন্তু এমন সুযোগ পেয়েও বিশেষ লাভবান হতে পারেনি। স্বাধীন বলে ঘোষনা করলেই ত মানুষ স্বাধীন হয় না। যে জাতী প্রাণহীন অর্থাৎ কল্পনা

ও অ-বাস্তবের উপাসক, কোন আকস্মিক শুভ ঘটনাতেই তার স্থায়ী কল্যান সম্ভব নয়। আবার চির জাগ্রত চির-কর্ম্ম-তৎপর জাতি যুদ্ধে বা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে মহাক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে ক্ষতি-পূরণ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এত বড় বিপদেও তাই জাপান তেমন অস্থির হয়ে পড়েনি। যদিও সবাই জানে, এই সাংঘাতিক ক্ষতি পূরণে জাপানের অনেক দিন লাগবে, তবুও এ'টুকু তারা বিশ্বাস করে—তাদের আত্মসংযম ও ঐকান্তিকতা জাতীয় উন্নতির পথগুলোকে সকল অবস্থাতেই সুগম রাখবে।

তাশিরোসান্ আরো বলছিলেন—রুসো-ভল্টেয়ারের আমল থেকেই পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন দূরদর্শী নেতা বুঝেছিলেন, সমগ্র জগতব্যাপী বিভিন্ন জাতীর মধ্যে যে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসছে, তাতে জাতীয় প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখতে হলে—সকল শ্রেণীর লোককেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে, সুস্থ, সবল, ও স্বজাতি-বৎসল করে তুলতে হবে। কিন্তু পুরুষানুক্রমে যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, দারিদ্র ভারে নিষ্পেসিত, উচ্চবর্ণের অত্যাচারে-অবিচারে জর্জ্জরিত, স্বজাতি-বাৎসল্য তাদের কমই হয়ে থাকে। কাজেই শক্তি সঞ্চয় করতে হলে, যারা জাতীর ভার বহন করছে, তাদের জাতির সমৃদ্ধি ও গৌরবের অংশ দিয়ে দলে টেনে আনতে হবে। কিন্তু চির-পদদলিতকে হঠাৎ মানুষের আসনে তোলবার ব্যাপারটী খুব সহজ এবং প্রীতিকর নয়—তাই ইউরোপের সকল জাতিই সে চেষ্টা করেনি। কিন্তু যে কয়টি পাশ্চাত্য-জাতি কিয়ৎ পরিমানেও সে পন্থা অবলম্বন করেছিল, তারাই আজ মহা বলশালী

ও সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য বিধাতা। অথচ চোখের সাম্নে এই দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও এসিয়ার কোন কোন দেশের নেতাগণ এখনও নিজেদের আভ্যন্তরিক আভিজাত্য অক্ষুন্ন রেখে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিষম বৈষম্য বজায় রেখে, পুরাতনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেই ব্যস্ত। এখনও হয়তো তাঁরা বিশ্বাস করেন, পুরাতন সভ্যতা ছিলো নিখুঁত এবং এসিয়ার গৌরব—আর বহু দোষে দুষ্ট এই আধুনিক সভ্যতা য়ুরোপের গৌরব হতে পারে; কিন্তু এসিয়ার নয়; কাজেই সর্ব্বতোভাবে তা পরিত্যজ্য। কিন্তু তারা ভুলে যান; দীর্ঘ-নিদ্রা ভঙ্গকারী এই আধুনিক সভ্যতা পুরাতন সভ্যতারই পরিণতি মাত্র। আর এ-ও ভুলে থাকেন যে এতে আপত্তিকর যা কিছু আছে, তার জন্য প্রধাণতঃ আমরাই দায়ী। কেন—না মানব সভ্যতার সার্ব্বজনীন ভাণ্ডারে এসিয়াবাসী আমরা, বহুদিনই আমাদের দেয় অংশ পাঠাই নাই। যে দিন থেকে তা দিতে সক্ষম হবো, সেদিন থেকে এর দোষ ত্রুটীও কমে যাবে— আমাদের দেওয়া অর্ঘ এর পুষ্টির সহায়তা করবে।

আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে জাপান যে কখনো এমন ঘোরতর ভ্রমে পতিত হয় নি, তা নয়। তবে জাপানের জন কয়েক মহা পুরুষ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসেই পুরাতনের মোহ জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা প্রচার করেন—যে সকল প্রথা কল্যাণ-কর তা বিদেশী হলেও বরণীয়। বিদেশীর কল্যাণকর পন্থাগুলো অবলম্বন করে' সুস্থ সবল হলে, আমরাও হয়তো একদিন বিদেশীকে দান করবার মতো সম্পদের সন্ধান পাব।

জাপান যে সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছে, এসিয়ার অন্যান্য জাতির তা না পাওয়ার কারণ, যে সন্ধিক্ষণের কার্য্যকলাপের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, সেই সন্ধিক্ষণ—সেই শুভলগ্ন, তারা হেলায় নষ্ট করেছেন। এশিয়ার বর্ত্তমান নেতাগণও যদি নানাবিধ কল্যানকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে' সেই মহাক্ষতি পূরণের জন্য তৎপর না হয়ে আধুনিক সভ্যতার দোষান্বেষণেই নিজেদের মহামূল্য সময়ের অপব্যবহার করেন, তবে প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সে-ক্ষতি, সে-সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবি, কেউ যদি আজ হিসাব-নিকাশ করে তার স্বরূপ দেখিয়ে দিতে পারতো তবে বোধ হয় জগৎ স্তম্ভিত হ'য়ে যে'ত।

তাসিরোশান একটু ভেবে আপন মনেই আবার বলতে লাগলেন, প্রকৃতির নিয়মকে অবিরত লঙ্ঘন করে কোন জাতিরই কখনও মঙ্গল হয় নাই। ধর্ম্মের নামেই হোক্ সনাতন প্রথার নামেই হোক্; অথবা আইনের দোহাই দিয়েই হোক, যখনই যে দেশের বিধি ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে, তখনই সেই জাতির অধঃপতনের সূত্রপাত হয়েছে। যে ব্যবস্থা সমাজের অধিকাংশ মানুষকে হীন করে রেখে, জাতীয় শক্তিকে শিথিল করে, উন্নতির প্রতিবন্ধকতা করে, সে ব্যবস্থাকে সনাতন বলে, ভগবানের অনুমোদিত বলে ঘোষণা করিলেও ভগবান তাতে ভোলেন না। ঐ ব্যবস্থার অপরিহার্য্য ফল—হয় শৈথিল্য প্রসার করে' উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সমাজের সকল স্তরকে আড়ষ্ট করে রেখে জাতিকে মৃত্যু-মুখে প্রেরণ করবে, নয়ত চির-নিপীড়িত

শ্রেণীর ধৈর্য্যের সীমাচ্যুতি ঘটলে তারা বিপ্লবের পথে মুক্তিলাভ করে নিপীড়ক সমাজের বহুকাল সঞ্চিত বিপুল পাপরাশির যথাসাধ্য প্রতিশোধ নেবে। এখনো ধর্ম্ম বা সামাজিক শুচিতার নামে—দুর্ব্বল অশিক্ষিত জনগণের উপর,—অসহায়া নারী জাতির উপর, কুশিক্ষিত শ্রেণীবিশেষ যে সমস্ত কঠোর বিধি-ব্যবস্থ চালিয়ে আসছেন, এশিয়ার বর্ত্তমান দুর্গতি তারই অনিবার্য্য সাস্তি নয়কি ?

সৌভাগ্যের বিষয় তুরস্ক এতকাল পরে তার ভ্রম বুঝ্তে পেরেছে। তার বিগত মহা গৌরবের দিনে যে বিধি-ব্যবস্থা সে মেনে চল্তো, ভেবেছিল তা অব্যাহত রাখলেই সেই গৌরবরবি চিরদিনের মতো তার ভাগ্যাকাশে উদিত থাকবে, কিন্তু তা হয়নি। সমাজ সজীব ও সচল, স্থায়ী নিয়ম কানুনের বশবর্ত্তী হওয়া তার চলে না। বহুতর কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে, দুর্ভাগ্যের চরম প্রান্তে পৌঁছে, অবশেষে তুরস্কের মোহ ভেঙ্গেছে। তাই সে আজ পুরাতন আবর্জ্জনা ত্যাগ করে; তার নবাবিষ্কৃত ক্ষমতাবলে বলীয়ান হয়ে, নববেশে, নূতন গরিমায় জগতের আসরে দাঁড়িয়েছে। সত্য বটে তার বিশাল সাম্রাজ্য আজ বহু পরিমানে খর্ব্ব, পূর্ব্বের সেই বিপুল সৈনিক বলেরও এখন অল্পই অবশিষ্ট, তথাপি 'বৃদ্ধ রুগ্ন' বলে এখন আর কেউ তাকে টীট্কারি দেয় না। আজ আর সে পুরাতনের মোহের নিকট জাতীয় কল্যানকে বলি দিতে প্রস্তুত নয়, আজ তার বিচার বুদ্ধি ফিরে এসেছে, সে জাতীয়তা অর্জ্জন করেছে। তাই 'ক্ষুদ্র' হলেও এখন সে আর

'বৃদ্ধ-রুগ্ন' নয়। এখন সে বৰ্দ্ধনশীল, উদ্যমশীল স্বাস্থ্য কামী নবীন জাতি।

এইরূপ অনেক কথাই সেদিন হয়েছিল। অধিকন্তু যে-সকল মহাপ্রাণ জাপানীদের আত্মত্যাগ ও জীবণব্যাপী সাধনার ফলে, অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন, আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন, রুগ্ন-ভগ্ন-মোহাচ্ছন্ন প্রচীন জাপান নূতন জীবন ও যৌবন লাভ করে' আজ গৌরব-মণ্ডিত, তাঁদের কারো কারো সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তও জান্‌তে পেরেছিলাম। মানব জন্ম সার্থক করবার সে কি পথ নির্দ্দেশ—কি মহা-ইঙ্গিত। শুনে যেন আশায় আনন্দে, ভক্তিতে মন উদ্বেলিত হয়ে উঠে। ঐ প্রসঙ্গ শেষ করতে যেয়ে তাসিরোশান বল্লেন—দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এমন অনেক লোক পাওয়া যায়; কিন্তু দেশের জন্য বেঁচে থাকৃতে যে বহুদিনব্যাপী অবিচলিত দেশ-প্রেম দরকার তা অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। দেশের জন্য জীবন দিতে যত লোক প্রস্তুত তার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই কুপ্রথা কুসংস্কার বলি দিতে রাজী। অধিকাংশ লোকের অন্তরেই প্রচীন প্রথার স্থান জাতীয় কল্যানের অনেক উর্দ্ধে—ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের প্রতিই তাদের অধিক আশক্তি। কেননা যুগ-যুগান্ত ব্যাপী মানবের সমস্ত প্রয়াস ফলের সঙ্গে, অর্থাৎ যে অসহনীয়, অকম্পিত অপরিসীম দুঃখ যাতনার বিনিময়ে মানব জাতি অদ্যাবধি যতটা সফলতা অর্জ্জন করেছে, সভ্যতার পথে যতদূর অগ্রসর হয়েছে, তারই সঙ্গে, প্রাচীন পন্থীগণ নিজেদের সঙ্কীর্ণ জীবণের অস্পষ্ট মূহূর্ত্তটির তুলনা করেন বলেই, আধুনিকতাকে অতীতের তুলনায় অতি

অকিঞ্চিৎকর বলে তাদের মনে হয়। কিন্তু ইতোসামা ও ওকুমা-সামার (Prince Ito & Count Okuma) অপূর্ব্ব দূরদর্শিতা, অসাধারণ বিচক্ষণতা, অসীম সাহস এবং সর্ব্ব বিঘ্নজয়ী হবার দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে জাপানে সত্যের জয় হল'—স্বদেশী দলের পরাভব হল—জাপান মুক্তিলাভ করলো।

একটু খানি থেমে তিনি আবার সুরু করলেন—যে কোন জাতি অতীতের মোহ পাশ থেকে মুক্ত হয়ে, কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে জাতীয় কল্যানের সর্ব্ববিধ কর্ম্মে তৎপর হয়, তার দুর্গতির অবসান অবশ্যাভাবী। জাপান ও তুরস্ক এর জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী। আফগানিস্থান ও মিশর দেশ যে পরিমানে আধুনিক ভাবাপন্ন, ঠিক সেই পরিমানেই উন্নত। চীন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও আমার মনে হয় ঐ কথাই খাটে। তথাপি এশিয়াবাসী প্রত্যক্ষ যুগ-ধর্ম্ম অস্বীকার করে পুরাতনেই আসক্ত। পাশ্চাত্য জাতিদিগের স্বার্থপরতা এশিয়ার দুর্ভাগ্যের মুখ্য কারণ নয়, ইহার প্রকৃত কারণ প্রচীন সংস্কারের দাসত্ব। এই দাসত্ব, এই আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পার্‌লে অন্য কোন বন্ধনই আর টিক্‌বে না।

মাসীমা আক্ষেপ করে বলছিলেন—এইরূপ কত কথাই যে সেদিন তাদের হয়েছিল, তাঁর সব কথা যদি ঠিক মনে রাখতে পরেতেন! অপরাহ্ণে তাদের বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলো। ওনামীসান্ হিবিয়া (Hibia) পার্কে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তার মা বল্লেন—আজ রবিবার, সেখানে বেশী ভিড় হবে বরং শিনাগাওয়ার সমুদ্র উপকূলে তেমন জনতা হয় না এবং তাঁর

বিশ্বাস ঐ স্থানটি মাসীমার ভাল লাগবে। তখন সকলে মিলে ট্রামে চরে সিন্থানী ষ্টেসনের দিকে রওনা হলেন।

এবারও চিঠি খুব বড় হয়ে গেল। আজ এখানেই শেষ করি, নইলে তোর পড়ার ধৈর্য্য থাক্‌বে না। আশা করি সবাই ভাল আছিস স্কুলের খবর চাই।—

ইতি—

তোর-রাণু।

— ছয় —

গেণ্ডেরিয়া
৯ই জানুয়ারী।

ভাই মিনি,

তোর পঁচিশে তারিখের চিঠি পেয়ে খুসী হ'লাম। জাপানের গল্প এরি মধ্যে শেষ হয়ে যাবে শুনে তোর দুঃখ হচ্ছে নাকি? তা কি করবো বল্? আমারত ইচ্ছে ছিলো অনেক কিছুই তার কাছে জেনে রাখি, কিন্তু তা আর হলো কোথায়? না ভাই, তারা গিয়ে অবধি কোন চিঠি দেননি।—দিবেন যে-না তাতো বলেই গিয়েছেন কাজেই সেই বৃথা আশা আমি করিও-নি। সুষমার চিঠি বোধ হয় তুই দেখেছিস্—খুব ঠাট্টা করেছে— না! তাকে বলিস্, ভাষা বিন্যাস সবটাই আমার নিজের নয়। মাসীমার একখানি খাতায়

জাপান সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা তিনি লিখে এনেছেন বোধ হয় ভবিষ্যতে বই লিখবার জন্যে। খাতা খানি নিয়ে গোড়া থেকে খানিকটা টুকে নিতে পেরেছিলাম, তাই এতটা লিখ্‌তে পেরেছি—বুঝলি ?

হঙ্গকু থেকে ট্রামে চড়ে সিম্বাসী ষ্টেসনে পৌছিতে নাকি আধ ঘণ্টারও বেশী লাগে। সিম্বাসীর পরের ষ্টেসন শিনাগাওয়া, তোকিও হতে ইয়াকোহামার পথে পড়ে। তিনি বলছিলেন,—সিম্বাসী থেকে ট্রেনে দশ মিনিটও বোধ হয় লাগেনি। কাজেই অবিলম্বে গন্তব্য স্থানে পৌছ্‌লাম। সত্যি ষ্টেসনটি একেবারেই সমুদ্রের উপর। তখনকার সমাগত—প্রায় গোধূলির স্নিগ্ধ আলোয় তরঙ্গহীন সমুদ্রের দৃশ্য মনোরম দেখাচ্ছিল। অনতিদূরে দু'-তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপ জলের উপর যেন ভেসে রয়েছে। তার পরই দূরে—বহুদূরে দিগমণ্ডলব্যাপী নীল সমুদ্র অনন্ত নীলাকাশের আলিঙ্গনে স্তব্ধ. শান্ত। কিন্তু তখন আমরা সেই দৃশ্য উপভোগ না করে অপরাহ্ণের অপরিহার্য্য চা-পানের জন্য নিকটবর্ত্তী এক রেস্তরাঁতে প্রবেশ করলাম।

চা পানের সময় তখন প্রায় অতীত হয়েছে। তবুও সেখানে তখন আরও একটি জাপানী পরিবার—বিলাতি পরিচ্ছদ পরিহিত একটি ভদ্রলোক তার স্ত্রী ও তিনটি ছেলে মেয়ে, সবে মাত্র চা পানের আয়োজন করছেন। আমাকে দেখে দোকানের সকলেই যে বিস্মিত হ'ল তা বলাই বাহুল্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তিনটি এতই তন্ময় হয়ে আমাকে দেখতে লাগলো যে

সুমিষ্ট ওকাশির (কেক্) প্রতিও তাদের আর রুচি ছিলো না। পিতামাতা সন্তানদের ব্যবহারে লজ্জিত হচ্ছেন, স্পষ্টই বুঝা গেলো। মাতার পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিতে মেয়ে দু'টি অবশেষে অনেকটা সংযত হলো—কিন্তু ছেলেটি অবুঝ শিশুমাত্র, কিছুতেই সে বাগ মানলে না। অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে দেখিয়ে বারে বারেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলো— ও মহিলাটি কে মা? এপ্রশ্নটি সে বোধ হয় তখনই তার দিদিদের নিকট শুনে থাকবে, তাই উত্তরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তার বাল-সুলভ সুমিষ্ট কণ্ঠে কেবলই আবৃত্তি করতে লাগলো—'আনো ওন্নাসান্ ওয়া দনাতা দেচ্‌কা ?' —অর্থাৎ 'এ' মহিলাটি কে-গো ?

শিশুর পিতামাতা দেখলেন, কিছুতেই আর ছেলের বাগ মানান গেল না, অগত্যা তাঁরা অতি তাড়াতাড়ি দুই চুমুকে চা নিঃশেষ করে উঠে পড়লেন। যাওয়ার সময় শিশুর মা আমাদের টেবিলের নিকট এসে ওাশিরো-গৃহিনীকে বললেন, তার ছেলে মেয়েদের অশিষ্ট ব্যবহারে বিদেশী মহিলাটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করছিলেন—তিনি ও তার স্বামী সেজন্য বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত। তার একান্ত অনুরোধ ওবাসান্ (গিন্নি) যেন তাদের হয়ে বিদেশী মহিলাটির নিকট সানুনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চান।

ওবাসান যখন তাঁদের হয়ে আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছিলেন, তখন ছেলে মেয়েদের নিয়ে তারা বেরিয়ে গিয়েছেন। ব্যাপারটি বুঝ্‌তে পেরে আমি আশ্চর্য্য ও ততোধিক কুণ্ঠিত হলাম। আমার অসুবিধা হবে মনে করেই না ঐ ভদ্র পরিবার

তাদের সম্মুখের চা ও খাবার স্পর্শ মাত্র করে উঠে গেলেন। অপরের অসুবিধায় কুণ্ঠাবোধ জাপানীদের সে মজ্জাগত, তা আগেও লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তার এমন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে আর কখনো দেখিনি।

চা পান শেষ করে উঠে দেখি সন্ধ্যা প্রায় অতিক্রান্ত। চায়ের দোকান থেকে সমুদ্রের একেবারে ধার দিয়ে আমরা দক্ষিণ দিকে চললাম। তটভূমি এঁকে বেঁকে একস্থানে একটি পাখির ঠোঁটের মত হয়ে সমুদ্রের দিকে বার হয়েছে। ঐ স্থানটিতে প্রস্তরেরই আধিক্য, তথাপি কয়েকটি দেবদারু বৃক্ষ সমুদ্রের আস্ফালনে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে কোলাহল ক্লান্ত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই যেন সে স্থানে বিরাজমান। বিশ্রামের অমন সুন্দর স্থানে পৌঁছে তাশিরো-পত্নী বললেন,—এই স্থানটি তার বড় ভাল লাগে, যেমন নির্জ্জন তেমনিই যেন এক আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ—বিশেষতঃ এই সন্ধ্যার ম্লান আলোয়। আমি মুক্ত কণ্ঠে তার কথায় সায় দিলাম। পাথরের উপরেই সকলকে বসতে হল'। অস্তামিত সূর্য্যের রক্ত-রশ্মি তখন পশ্চিমাকাশ উদ্ভাসিত করে নীল সমুদ্র গর্ভে মিলে গেছে। মুগ্ধনেত্রে সেই দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলাম। পরে চমক ভাঙ্গলে তীরের দিকে চেয়ে দেখি, দক্ষিনে ও বামে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, বৈদ্যুতিক আলোক শৃঙ্খলে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল গ্রথিত। সেই সমুদ্র চুম্বিত কোলাহল বর্জ্জিত শান্তিময় কুঞ্জে বসে, অসংখ্যক আলোক প্লাবিত অদূরের বিশাল রাজধানীকে যক্ষ-পুরী বলে ভ্রম

হচ্ছিল। আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে দুইটি দৃশ্য তার মধ্যে কি আশ্চর্য্য পার্থক্য ; একটি কর্ম্ম-ব্যস্ত কোলাহলময় মানব-জীবনের বিকাশ চিত্র; অপরটি প্রকৃতির আত্মমহিমা—কি অপরূপ! একটু আগে মানুষ গড়বার সতর্ক প্রয়াসের যে-দৃশ্য চায়ের দোকানে দেখে এলাম; তার সৌন্দর্য্য তো আমার চোখে কম নয়। আমার একটু অসুবধার আশঙ্কা করে' যে জাপানী দম্পতী তাঁদের ক্রিত চা ও মিষ্টি থেকে নিজেদের ও প্রিয়তম সন্তানদের অনায়াসে বঞ্চিত করলেন. কে জানে—রেস্তরাঁতে চা পানের সৌভাগ্য প্রতি রবিবারই তাদের ঘটে উঠে কিনা ?

আমি মনের ভাব চেপে নিতে না পেরে বললাম. আমার অসুবিধার অমূলক আশঙ্কা করে' একটি ভদ্র পরিবার তাদের সম্মুখের চা ও খাবার থেকে বঞ্চিত হলেন বলে আমার সত্যি বড় দুঃখ হচ্ছে।

তাশিরোপত্নী বললেন,—হাঁ, তাদের প্রতি সহানুভূতি হয় বটে ; কিন্তু শিশু যখন কিছুতেই মানলে না, তখন উঠে না গিয়ে আর কি করবে বল! শিশুর অশিষ্টতা সত্ত্বেও যদি চা শেষ না হওয়া অবধি তাঁরা বসে থাকতেন, তবে তার অশিষ্টতারই প্রশ্রয় দেওয়া হ ত নাকি ?

"কিন্তু ঐটুকুন শিশু শিষ্টতা-অশিষ্টতার কি বোঝে"!

"বোঝে না বলেই তো বোঝান দরকার।"

হাঁ, তা বটে, তবে যে শিশু অবুঝ তাকে বুঝাবো কি করে ?

'—অন্যায় করতে যেয়ে বারে বারে বাধা পেলে শিশুদেরও

বুঝ্‌তে বাকী থাকে না—কোন্ কাজে আত্মীয় স্বজন তুষ্ট ও কোন্ কাজে রুষ্ট হন। কোন কোন পিতামাতা ছেলে মেয়ের অন্যায় আব্দার সহ্য করেন, তাদের অশিষ্টতায়, যথেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দেন। এ' রকম স্নেহ প্রকাশের অর্থ হচ্ছে, তাদের মানব সমাজের অযোগ্য করে গড়ে তোলা আর তাদের ভবিষ্যতের জন্য বহু কষ্ট সংগ্রহ করে রাখা, নয় ক ?

তার কথা অস্বীকার কর্‌তে না পেরে বললাম,—দেখুন আমার ছোট ভাই বোন কিছু নেই কিনা, তাই শিশুদের বিষয়ে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি। তবু আমার মনে হয়, জাপানে সন্তান মানুষ করবার যে সুন্দর প্রণালী, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে যে-সতর্কতা, যে আন্তরিক চেষ্টা দেখ্‌ছি, অন্য কোন জাতির মধ্যে তা' আছে কিনা জানি না।

'না—এ' তোমার ভুল। সন্তান মানুষ করবার যে প্রণালী আমরা অবলম্বন করেছি, তার সবটাই প্রায় পাশ্চাত্য জাতিদের অনুকরণ; তবে যে আন্তরিক চেষ্টার কথা বল্লে, সেইটিই আমাদের নিজস্ব। হয়ত শুনেছ, জাপানে পূর্ব্বপুরুষদের পূজা করা প্রচলিত—তাকে আমরা বলি 'বুশিদো'। এই পূজার প্রধান উপকরণ হচ্ছে নিজের কর্ম্ম ও মহত্ত্ব দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি করা। তা শৈশব থেকে যদি ছেলে মেয়েদের নীতি ও শিষ্টাচার না শেখান হয়, তবে তারা অশিষ্ট ও স্বার্থপর হয়ে উঠবে। তা' কি তাদের পরিবার বা দেশ, কারো পক্ষেই ভালো হবে?—না তাতে পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব বাড়বে? চীনের যে এত দুর্গতি তার প্রধান

কারণ, আমার মনে হয়, ছেলে মেয়ের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে তারা যেমন ওদাসীন, ছেলে মেয়েরাও বড় হয়ে পরিবার ও দেশের গৌরব সম্বন্ধেও তেমনি নিস্পৃহ।

'—তা হ'লে দেখেছি ছেলে-মেয়ের সুশিক্ষার উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করছে। ভারতেও এক সময়ে এ'-বিষয়ে খুব সতর্কতা ছিলো—এখন তেমন নেই।

আমার কথা শুনে তাশিরোসান স্ত্রীর দিকে কেমন কটাক্ষ করলেন, তার তাৎপর্য্য আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

তাশিরো-পত্নী বললেন,—হাঁ, ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষার উপরেই জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কেন-না, সুশিক্ষিত ছেলে-মেয়েই তো বড় হয়ে গুণবান্, চরিত্রবান মানুষ হবে, তাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও নিষ্ঠা দ্বারা জাতীর সব অভাব পূর্ণ করে—জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি কর্‌বে। জ্ঞান ও চরিত্রবান মানুষের যে দেশে যতো বেশী সমাবেশ, সে জাতী ততো বেশী উন্নতিশীল।

'—আপনি যে—শিক্ষার কথা বল্‌ছেন, সে-শিক্ষা দেওয়াও তো সহজ নয়' ?

'হাঁ গোড়াতে হয়তো কঠিন, তার পরে সহজ। শিক্ষা দিতে হলে আগে শিক্ষা লাভ করতে হয়। কেন-না, শৈশবে যারা সুশিক্ষা ও উন্নত সংসর্গ হতে বঞ্চিত, পরিণত বয়সে তারা প্রায়ই মানুষ হতে পারে না। দেশের চিন্তা, জাতির চিন্তা তাদের মনে এলেও নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভনে তা' উড়ে যায়। জাতীয় কল্যানকর কোন কাজে আত্মনিয়োগ করবার সংকল্প

মনে এলেও দীর্ঘকাল তারা তা' কর্‌তে পারে না। মনের বল কম—বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তাদের দেশ-প্রেম মতামত প্রকাশেই নিঃশেষ হয়ে যায়,—কাজেই মানুষ গড়ার মতো বড় কাজ তাদের জন্য নয়।

গোড়াতে জাপানে কয়েকটি কেন্দ্রে বাছা বাছা লোক সংগ্রহ করে' নৈতিক আব-হাওয়া ও উন্নত সংসর্গের সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের মনোনীত করে সেই সকল কেন্দ্রে, শিক্ষা দেওয়া হয়। ক্রমে কেন্দ্রের ও ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বাড়্‌তে থাকে। তারই ফলে নব মন্ত্রে দীক্ষিত নর নারী সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে দেশের আব হাওয়া ও জাতিয় চরিত্র উন্নত করেছে।

তখন আমার মনে হলো, আমাদের দেশেও যেখানেই তেমন কোন মানুষের উদ্ভব হয়েছে, সেখানেই জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে—তারই অনুপ্রেরনায় সে সব স্থানে এক একটি জীবন্ত সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। তাই বল্‌লাম—হাঁ, মানুষ তৈরী করাই জাতি গঠনের প্রথম ও প্রধান কাজ—।

—তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে ? পাশ্চাত্য জাতিদের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের এই নিগূঢ় তত্ত্ব জান্‌তে পেরেই না জাপান এতটা অগ্রসর হতে পেরেছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান জাতির দুঃখ মোচন করে' জাতিকে সমৃদ্ধিশালী ও শক্তি সম্পন্ন কর্‌বে, তা' পরিচালন কর্‌তে চরিত্রবান, একনিষ্ঠ ও দক্ষ লোকের দরকার। হানপ্রাণ দুর্ব্বল চরিত্র লোক কখনও কোন বড় কাজ কর্‌তে

পারে না—সুযোগ তার যতোই থাক। তাই মানুষ তৈরী করাই আগে দরকার।

—তবে কি পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ না করে' এসিয়ার পরিত্রাণের উপায় নেই ?

—একে পাশ্চাত্য আদর্শ বল্‌তে চাও বল্‌তে পার; কিন্তু যা সত্য, ধ্রুব এবং জন-হিতকর, তা তো কোন জাতি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। তা' ছাড়া বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে'—আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগীতায়—বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিজ নিজ শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবার চেষ্টায়—মানব সভ্যতা যে-ভাবে পরিণতি লাভ করেছে, পাশ্চাত্যের আজুহাত আর কি তাকে অগ্রাহ্য করা চলে ? তা' হলে ইউরোপের আদর্শে সমাজ সংস্কার প্রজাতন্ত্র শাসন—তাদের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সবই আমাদের পরিহার কর্‌তে হয়, এমন-কি বাষ্প-বিদ্যুৎও আমাদের পরিত্যজ্য, যে-হেতু তারাই ও-সবের আবিষ্কারক।

—না, আমি তা' বলছি না। আমি ভাবছিলাম যে, আমাদের দেশে পিতা-মাতাকে দেবতার মতো ভক্তি করা, তাদের আজ্ঞা পালন করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু ইউরোপে তা' নয়'।

—না, পাশ্চাত্য আদর্শ ঠিক তেমন নয়। সন্তান বড় হয়ে' আমাকে দেবতার মতো ভক্তি কর্‌বে, আমার আজ্ঞা অন্যায় ও অসঙ্গত হলেও অন্ধভাবে তা' পালন কর্‌বে, ইউরোপ আমেরিকার সুধী ব্যাক্তিগণ সন্তানকে এমন শিক্ষা দেন না। দেশের নিকট মানুষের যে অশেষ ঋণ তারই কিঞ্চিৎ শোধ হয়

দেশকে এক একটি যোগ্য সন্তান উপহার দিয়ে। কিন্তু দেশের নিকট আজীবন অশেষ উপকার পেয়ে তার বিনিময়ে যদি এমন একটি সন্তানও দিয়ে যাই, যা' দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা জাতীয় উন্নতির বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন হয়, তবে সে-যে দারুণ দেশদ্রোহিতা। কাজেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের গৌরবও যেমন অসাধারণ, তার দায়িত্বও তেমনি গুরুতর। সভ্য সমাজের সুখ সুবিধা ভোগ করেও যারা সন্তানদের সুশিক্ষা না দেন, তারা সন্তান ও দেশ, উভয়ের নিকটই অপরাধী। সন্তান আমার আজ্ঞাবাহী হবে, তার চেয়ে বড় আদর্শ এ নয় কি যে সে আমার চেয়ে, আমার পিতা পিতামহের চেয়ে, জ্ঞানী, গুণী ও যোগ্যতর হবে—অর্থাৎ অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ বড় হবে ?

সেই সুন্দর সমুদ্র-সৈকতে তথনকার অস্তমিত সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে বসে' এইরূপ অনেক মূল্যবান্ কথাই সেদিন শুনলাম। তারপর অন্যান্য কথা উঠল—হাসির কথা, আনন্দের কথা। সর্ব্বশেষে গানের পালা—ওনামীসান একে একে দু'টি গান গাইলেন। শুনলাম, সঙ্গীত দু'টিই বুদ্ধদেবের গৌরব গাঁথা, কিন্তু জাপানী সঙ্গিতে অনভ্যস্ত বলে তার সুর-তাল-মান সবই আমার কাছে অতি অদ্ভুত লাগলো। তারপর সকলে আমাকে ধরে বসলেন একটি ভারতীয় গান গাইতে। কিন্তু আমার সাহস হ'ল না। কারণ জাপানী সঙ্গীত আমার কাছে তেমন ভাল না লেগে থাকে, তবে আমার কণ্ঠের ভারতীয়

সঙ্গীত যে এদের চিত্ত মুগ্ধ করবে;—তা-মনে করবার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। তাই নিজের অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা ভিক্ষা করেই নিষ্কৃতি লাভ করলাম।

তখন রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই শিনাগাওয়ার শান্তি মাধুরী-ময় কুঞ্জের নিকট বিদায় নিয়ে অবশেষে আমরা তাকিওতে ফিরলাম।

এই থাক। এ' চিঠিও কতো বড় হয়ে গেল। সুষমাকে বলিস্। অত ঠাট্টা করলে জাপানের কথা আর আমি কিছুই লিখবো না। দ্যাখ আমি দু'খানি ভাল বই উপহার পেয়েছি। মাসীমারা যে দিন চলে গেলেন, তার পর দিনই বাবা আমার জন্য কলকাতার দু'খানি ভাল বইএর অর্ডার দিয়েছিলেন। কাল তা পেয়েছি। একটি হ'ল "জাপান ভ্রমণ" আর একটা Japan ইংরেজী এই খানিতে অনেক ছবি আছে আমি এখনও কিছুই পড়তে পারিনি; বাবা বারণ করে দিয়েছেন পরীক্ষার আগে পড়তে। ভালবাসা নিস্। ইতি—

তোর—রাণু।

— সাত —

গেণ্ডেরিয়া
২৪শে জানুয়ারী

ভাই মিনি,

তোর উনিশে তারিখের চিঠিখানি পেলাম। জাপানের কথা তো অনেক কিছুই তোকে লিখেছি, কিন্তু আজ যা পাঠাচ্ছি তা জাপান সম্বন্ধে না হলেও তার চেয়েও চমৎকার। আমার সেই মাসীমার চিঠি-পত্র বা খোঁজ-খবর যে কোন কালে পাবো সে আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু এত দিনে সত্যি সত্যি তাঁর একখানি চিঠি ও সেই সঙ্গে তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত পেয়েছি। কেন যে তাঁরা অম্‌নি করে হঠাৎ আমাদের বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলেন তা জানতে পারলাম। তাঁর সেই চিঠি ও দীর্ঘ কাহিনীটি তোকে পাঠাচ্ছি, তোর পড়া হয়ে গেলে ফেরত ডাকে আমায় পাঠিয়ে দিস্। ইতি—

তোর—রাণু

বেশী কিছু লিখতে পারছিনা পরীক্ষা। ইতি

তোর

১৩।২,..................লেন,

কলিকাতা।

১৭।১।২৬

স্নেহের [illegible],

অনেকদিন হ'ল তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি, কিন্তু এ অবধি একখানি চিঠি দিয়েও তোমাদের খবর নেই নি—আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদও জানাই নি। আমাদের মত অপরিচিতের প্রতি তোমাদের অপরিসীম আতিথেয়তা ও দুর্লভ আন্তরিকতার বিনিময়ে আমরা যে তোমাকে নির্ম্মম ভাবে কাঁদিয়ে এসেছিলাম, সে কথা মনে হলে লজ্জায়, এমন কি, আমার মাথাটাও নত হয়ে আসে। ভেবেছিলাম, তোমাকে কোন দিন চিঠি লিখ্‌বোনা। তোমাকে নিয়ে আমার জীবন-ইতিহাসের যে একটি করুণ-মধুর-সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে, নাড়া দিয়ে তাকে তিক্ত করবো না। কিন্তু ষ্টেশনে বিদায়-মুহূর্ত্তে তোমার সেই অশ্রু-সিক্ত মুখ খানি যখনই মনে পড়ে, আমার এই নিষ্ঠুর প্রাণটাও সত্যি করেই তখন বেদনায় ভরে' যায়, তাই আজ তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি। জানিনা আমার মত অচেনা এক অভাগিনীর প্রতি কেন তোমার এত মমতা, এত স্নেহ! আত্মীয়পরিজনের কাছে স্নেহ-মমতার প্রত্যাশা করে নিষ্ঠুররূপে বঞ্চিত হয়েছি বলেই বোধ হয় তোমার নির্ম্মল-উদার ভালবাসার আকর্ষণ আমার কাছে আজ এত বেশী।

তোমাকে ব্যাথা দিয়ে হাসি মুখেই তোমাদের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে ছিলাম। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তখন যা হচ্ছিল, আর কত কষ্টে তা চেপে ছিলাম, ঘুণাক্ষরেও যদি তুমি তা জানতে পারতে, তবে আর যাই হোক্, কঠিন আমায় ভাবতে পারতে না। আমাদের সেই নিষ্ঠুর ব্যবহারের কারণ তোমাকে বলতে গেলে, আমার জীবনের কলঙ্কময় কাহিনী তোমাকে জানাতে হয়। কিন্তু তার ফলে আমার প্রতি তোমার যে অকারণ শ্রদ্ধা ও মমতা জন্মেছে, জানি, তা আমি হারাব, তবুও বলছি। কেন না, প্রতারণা থেকে যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাওয়া যায় তাতে অন্যের কথা জানিনা আমার মত ঘৃণীতা নারী তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

তোমাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তায় মুগ্ধ হয়ে আমরা ভেবেছিলাম, তোমার বাবাকে আমাদের প্রকৃত পরিচয় না জানিয়ে তোমাদের অত আদর যত্ন ও সৌহৃদ্য গ্রহণ করা আমাদের উচিৎ নয়। বিশেষতঃ তাতে তোমার পিসীমার নিষ্ঠাচারের ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা। তাই সেদিন রাত্রে আমি যখন তোমার সাথে ঘুমাতে যাই, আমার স্বামী তখন তোমার বাবার কাছে আমার জীবনের গোপন কাহিনীটি প্রকাশ করেন। অমন উদার তোমার বাবা, তবু তিনি আমার কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। ক্ষণকাল নীরব থেকে মিঃ রায়কে অনুরোধ করেন, আমরা আর যে দু'দিন তোমাদের অতিথি হয়ে থাকবো,

সে দু'দিন আমি যেন একটু দূরে দূরেই থাকি, তোমার সঙ্গে বড় একটা না মিশি। ঐ অনুরোধের পর তোমাদের বাড়ী থাকা আমাদের সঙ্গত হ'ত না, তাই পরদিনই হঠাৎ ঐ ভাবে চলে আসি।

তোমার এত অনুনয় অনুরোধ নিষ্ফল হ'ল দেখে তুমি তোমার বাবাকে বলেছিলে, শুধু আর একটা দিন থাকবার জন্য আমাদের অনুরোধ করতে, এবং তিনি তা করেন নি বলে অভিমানে তোমার চোখে জল এসেছিল। তোমার স্নেহশীল পিতার তোমাকে অদেয় যে কিছুই নেই, তা ঐ একটি দিনের মধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। তবু তোমার সেই কাতর প্রার্থনাও যে তিনি অমনি করে অগ্রাহ্য করেছিলেন, তার কারণ, তোমার মঙ্গল চিন্তাই যে তাঁর বিপত্নীক জীবনের প্রধান ব্রত। আমার সঙ্গ, আমার দেহের অপবিত্র হাওয়া তোমার পক্ষে কল্যাণকর নয় মনে করেই তিনি সেদিন তোমার মনে ব্যথা দিতে বাধ্য হ'ন; নইলে তার মত সন্তানবৎসল পিতা খুব কমই দেখেছি।

যাক্, আজ আমার সেই গোপন ইতিহাসটিও তোমায় পাঠালাম। অনেক দিন হ'ল স্বামীর অনুরোধে অকপটে সব কথাই এতে লিখে রেখেছিলাম কখনো যে আর কাউকে দেখাতে হবে ভাবিনি। তোমার স্নেহের ঋণ শোধ করবার নয় জানি, তবু আমার কাছ থেকে এই মাত্র তার প্রতিদান হয়ত অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই টুকুই যে আমাদের সব।

পরিচয়

আমার পরিচয় জেনে তুমিও হয়তো তোমার বাবার মতই স্তম্ভিত হবে। প্রথম দেখামাত্র যাকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধেছিলে আপনার করে নিয়েছিলে—তাকে, তোমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিতা করবে; এমন কি, হয়ত স্মৃতি থেকেও চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করে রাখতে চাইবে। মানুষের অশ্রদ্ধায় অভ্যস্ত হয়েও, কি জানি কেন, আজ তোমার স্নেহে বঞ্চিত হব ভেবে চোখে জল আসছে, কিন্তু সকলের বিচারে আমার যা শাস্তি, তাকে ভয় করলে চলবে কেন! তোমার ভালবাসাও একদিন যেমন বুক ভরে নিয়েছিলাম, তোমার ঘৃণাও তেমনি মাথা পেতে নেবো। আমার পরিচয় পেয়েও যদি তোমার প্রবৃত্তি হয়—ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

শ্রীনিষ্কৃতী দেবী।

— পরিচয় —

— ১ —

আমার জন্ম-মুহূর্ত্তের ইতিহাসে তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছুই নেই। থাকবেই বা কী! একে গরীবের ঘরে জন্ম, তাতে আবার মেয়ে; কাজেই আদর অভ্যর্থনার বাহুল্য কিছু হয়েছিল বলে মনে হয় না। বাস্তবিক আমার সেই অনাবশ্যক আবির্ভাবে সেদিন কারো চোখে-মুখে এতটুক আনন্দের দীপ্তিও ছড়িয়েছিল কিনা সন্দেহ।

পূর্ব্ব বাঙালার একটি সাধারণ পল্লী—বাবা গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক—বেতন যৎ সামান্য। আমাদের বাড়ীতে দু'খানি মাত্র ছোট ছোট খড়ের ঘর—তাতেও আমাদের অসুবিধা কিছু ছিল না। জমী জমা ও সামান্য কিছু ছিল—সংসার যদি বা তাতে কোন রকমে চলতো, কিন্তু তার বেশী আর কিছুই না। শৈশবের ইতিহাস সামান্য—লেখাপড়া তেমন শিখিনি। আমার বাল্যের শিক্ষা "বাল্য-শিক্ষা"তেই বাধা পড়ে। পড়লেই বা, লেখাপড়া না হলে কি আর দিন চলে না? আমার তো বেশ চলে যাচ্ছিল। একদিন—বয়স আমার তখন কতই বা—সে সন্ধানের প্রয়োজনও বুঝি ছিল না—সমাজের অপরিহার্য্য বিধানে ঐ এগারো বছরেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। পরম আত্মীয় ও শুভাকাঙ্খীরা সেদিন নিশ্চয় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

কন্যাদায় হতে ত তাঁরা উদ্ধার পেলেন, কিন্তু তারপর একটি বছরও বুঝি কাটেনি। আমার ঐ উন্মুখ কৈশোরেই যা' ঘটলো, তা যে কত বড় দুর্ভাগ্যের তার কিছুই তখন বুঝিনি,—বুঝবার শক্তি তখনও হয় নি। একদিন মর্ম্মান্তিক খবর এল—আমি বিধবা হয়েছি—হিন্দু বিধবা।

ঐ দুর্ভাগ্যের পর হতেই বাবার স্নেহ যত্ন ও ভালবাসা বেশী করেই আমার জীবন-টাকে আশ্রয় করলো। আমার দুঃখ কষ্টের লাঘব হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবন পুণ্যময় হবে ভেবে তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গেই আমাকে লেখা পড়া শেখাতে সুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যে বেশ উন্নতিও হল। মহাপুরুষদের জীবন চরিত, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, এ-সমস্তর চর্চ্চা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই চলেছিল। রামায়ণ-মহাভারত পড়তেও তখন আমার আর বেগ পেতে হ'ত না, আরও কত কি ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়বার কল্পনা চলছিল, কিন্তু হায় তা আর ঘটলো না। আমার দুর্ভাগ্যের পর দু'টি বছর যেতে না যেতে হঠাৎ একদিন মায়ের সীমন্তের সিঁদুর রেখা নিঃশেষে মুছে গেল। আমাদের সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে, কলেরা রোগে, বাবা আমার ইহলোক থেকে চির-বিদায় নিলেন।

মামা-বাড়ী ছিল কাছেই—একখানি মাঠ পার হলেই তাদের গ্রাম মামার অবস্থাও স্বচ্ছল নয়। কিন্তু নিরুপায় আমরা অগত্যা তারই গৃহে আশ্রয় নিলাম। জমীদার-সরকারে তিনি কাজ করতেন—আয় যা হ'ত তাতে কোন রকমে সংসার

চলতো। আমাদের একবেলার সংস্থান—যে জমীটুকু সম্বল ছিল—তাতেই হত। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি তখন।

মামার ছেলে দুটি—নিখিলদা ও অখিল। মেয়ে একটি নাম কল্যাণী। নিখিলদা আমার চেয়ে একুশ দিনের বড়, গ্রামের ইংরেজী স্কুলেই সে পড়ে—লেখাপড়ায় বেশ অনুরাগ। আমাকে সে পড়া শোনায় উৎসাহ দিত এবং সাহায্য করতো—আবার ভাল ভাল বইও সে সংগ্রহ করে এনে আমায় পড়তে দিত। ক্রমে তার কাছে আমি ইংরেজী শিখতে সুরু করলাম। কিন্তু সেটা মা ও মামার বিশেষ পছন্দনীয় হলনা। তাঁরা বল্লেন, বিধবার অতিরিক্ত বিদ্যা, বিশেষ করে ইংরেজী শেখায় না'কি যথেষ্ট অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। তাঁদের এহেন উক্তি নিখিলদা কিন্তু কাণেও তুললে না—আমার শিক্ষা যথা-রীতি চলতে লাগ্‌লো।

নিখিলদার প্রতিভা ছিল। পড়া-শোনাতে যেমন সে অপ্রতিদন্দী খেলা-ধূলা ও জন-হিত-কর কাজেও তেমনি উৎসাহী। কাজেই সেই ছিল তাদের দলের নেতা, তাই ছেলের দল প্রায়ই তার কাছে আসতো, কতই না তাদের মন্ত্রনা—কতই তাদের তর্ক বিতর্ক! ঐ দলেরই একজনের নাম রিয়াজুদ্দিন। বয়সে যদিও সে নিখিলদার চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের বড় এবং বছর তিনেক আগে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ফেল্ করে পড়া শোনায় ইস্তাফা দিয়েছে, কিন্তু ছেলেদের সংশ্রব ত্যাগ করেনি। শুনেছি খেলা-ধূলাতেও সে যেমন অভ্যস্ত, জনহিতকর

কাজেও তেমনি উদ্যোগী। নিখিলদার মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না—দু'টিতে যেন হরিহর আত্মা।

রিয়াজদের অবস্থা খুবই ভাল—কোঠা বাড়ী ও অনেক লোকজন, তার বাপ ব্যবসায়ী লোক—বিস্তর টাকার মালীক। রিয়াজের বাবুয়ানী যথেষ্ট, তবে সাহিত্যের উপরও তার ঝোঁক ছিল। খান কয়েক মাসিক পত্রের যে গ্রাহক—তাছাড়া কলকাতা থেকে প্রায়ই সে ভাল ভাল বই আনাতো। তাতে অবশ্যি আমার খুব সুবিধা হয়েছিল নিখিলদার মারফৎ সে সব বই আমিও পড়তে পেতাম।

এমনি করেই জীবনের দিন গুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। এমন সময়, পাড়ার মেয়ে ও বধূদের জন্য, আমাদের বাড়ীতেই একটি স্কুল খোলা হ'ল, এবং শিক্ষার ভার পড়লো আমারি উপর, সত্যি জীবনে সেদিন যেন এক অভিনব আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলাম। আমাকে দিয়েও যে গ্রামের মেয়েদের সামান্য উপকারও হতে পারে, কোন দিনই তো তা কল্পনায় জাগেনি। তৃপ্তিতে সারা মন আমার ভরে উঠলো। সেদিন সত্যি মনে হয়েছিল যে আমার এত দিনের শিক্ষা আজ সার্থক হলো।

আমাদের স্কুল বসত' দুপুরে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য। সংসারের কাজ কর্ম্ম সব সেরে বধূরা স্কুলে আসতেন। বাস্তবিক তাদের সময় খুবই কম তাই অতি অল্প সময়ের জন্যই স্কুল বসতো।

তবে সময় কম হলেও তাঁদের উৎসাহের অভাব ছিল না—একে একে বাইশটি শিক্ষার্থিনী এসে জুটলো।

স্কুল খোলার পর থেকেই দিন গুলো যেন কত হাল্কা হয়ে গেল। প্রভাতের প্রথম আলো বিকশিত হতে না হতেই ঘুম ভাঙতো। তরুণ সূর্য্যের সোনালী রশ্মী এসে যেন আমার এই নব-জীবনের যাত্রা পথটিকে নিত্য নূতন করে রাঙিয়ে দিয়ে যেতো। আমার জীবনটাও আর উদ্দেশ্য-হীন অনর্থক নয়—আমারও ভাববার মত বিষয়ও করবার মত কাজ আছে; এক কথায় আমার ঘাড়েও দায়িত্ব আছে। হায়—সেই লুপ্ত অনুভূতি! এমনি করে একটি বছর কেটে গেল। আমার জীবনের অবশিষ্ট দিন গুলো কি এমনি তৃপ্তি ও সার্থকতায় কেটে যাবে? সেবা ও সাধনার কত কল্পনাই না সেদিন মনে বাসা বেঁধেছিল।

নিখিলদা সেবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিল, তাই কলেজে পড়তে ঢাকায় চলে গেল। ফলে পড়া-শোনার ব্যাপারে তার সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হয়। অখিল ছিল—অতঃপর সেই আমাকে বই যোগাড় করে এনে দিত।

— ২ —

অনেকদিন পরের কথা—বোধ হয় বছর তিনেক হবে। নিখিলদা তখন বি, এ, পড়েন। প্রতিভাবান বলে কলেজেও তাঁর খুব সমাদর তখন। তিনটি বছর সহরের আবহাওয়ায় তার যেমন উন্নতি হয়েছে এমনটি বড় দেখা যায় না। আগে সে গ্রামের উন্নতির কথাই শুধু আলোচনা করতো, এখন ভারতের স্বাধীনতার কথা বলে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-পদ্ধতি—সবই যে লুপ্ত হতে বসেছে,—এ জন্য তার আপশোষ ও অনুযোগের অন্ত ছিল না। প্রতি ছুটিতেই গ্রামে এসে, স্কুলে সভা ডেকে সে বক্তৃতা দিত। হিন্দুর আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য আদর্শের, অর্থাৎ ত্যাগের সঙ্গে ভোগের, পরার্থ-পরতার সঙ্গে স্বার্থ-প্রিয়তার, ভক্তির সঙ্গে ভাণের তুলনা দিয়ে অতি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে বলতো—বিদেশী ভাবাপন্ন বলেই আজ আমাদের এত অধঃপাত। আর্য্য ঋষিদের মত সাত্ত্বিক ভাব এবং সহজ সরল জীবন অবলম্বন না করলে হিন্দুর রক্ষা নেই—তার অস্তিত্ব লোপ অবশ্যম্ভাবী। এই সব বক্তৃতার মাহাত্ম্যে নিখিলদার খ্যাতি-প্রতিপত্তি গ্রামে খুবই বেড়ে গেল।

বসু-বাবুরা গ্রামের জমীদার। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারটিকে বিদায় দিয়ে সেখানে যাতে একটি

কবিরাজ নিযুক্ত হন, তারই চেষ্টায় নিখিলদা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ছোটবাবু ·নাকি রাজিও হয়েছিলেন, কিন্তু বড় বাবু একজন খেতাবী লোক—রায় বাহাদুর—কাজেই এহেন প্রস্তাবও তিনি অগ্রাহ্য করলেন।

এই চেষ্টা নিষ্ফল হল বটে কিন্তু অত সহজে দমে যাবার লোক নিখিলদা নয়। আর এক দিকে তার দৃষ্টি পড়লো। আবার পূর্ণ উদ্যমে বক্তৃতা সুরু হল—হিন্দুর ছেলে, যারা গ্রামে বাস করে, তারা জুতার পরিবর্ত্তে যেন পবিত্র কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার করে।

বাস্তবিক নিখিলদা গ্রামে এলে আমাদের নির্জ্জীব গ্রাম খানিতেও এমনি একটা জীবনের সাড়া পড়ে যেত। তাই'ত নিখিলদার এত সুখ্যাতি; এমন কি গ্রামের যারা প্রবীন তাঁদের মুখেও নিখিলদার প্রশংসা শুনেছি। মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করেছি—আমি তারই· বোন, তারই আদর্শে আমিও পরিচালিতা। ঐতো বয়স—কিন্তু কি অসাধারণ বুদ্ধি, আর এরই মধ্যে কতইনা বিস্তৃত খ্যাতি। তার জীবনের এমন সার্থক পরিণতি স্বপ্নেও বুঝি কেউ কোন দিন কল্পনা করেনি।

নিখিলদা তখন ঢাকায়। একদিন টেলিগ্রাম এলো—তাঁর কলেরা হয়েছে। মামা সেই মুহূর্ত্তে সেখানে রওনা হয়ে গেলেন। আমরা দারুণ দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে পড়ে রইলাম। কি দুঃসহ উৎকণ্ঠায়ই না আমাদের দিন

কাট্‌ছিল। সর্ব্বদাই আতঙ্ক, কখন কি খবর অসে। মনে হত, এক একটা দিন-রাত যেন কত দীর্ঘ, কিছুতেই শেষ হতে চায় না। হায়রে, তখন ত একবার কল্পনায় ও জাগেনি যে এর চেয়েও বড় বিপদ কিছু হতে পারে।

সেই কাল রাত্রি-রাত তখন গভীর আবছায়া জ্যোছনায় চারদিক কেমন আড়ষ্ট। অদূরের গাছ পালার আড়ালে পশ্চিমাকাশের অস্তম্মুখী চাঁদের আলো পত্র-পল্লবের সহস্র রন্ধ্র-পথে লুকোচুরী খেলছে। অবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সে রূপ কিইনা স্তব্ধ, জমাট ! বুকের একান্তে যেন ভয়ের সঞ্চার আনে।

মামাতো বোণ কল্যাণী বাইরে গিয়েছিল, সঙ্গে ছিলাম আমি। মামীমা চির-রুগ্না এবং মার শরীরও সেদিন ভাল ছিল না তাই আমাকেই সঙ্গে যেতে হয়েছিল।

পাড়াগায়ের পায়খানা বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে। কল্যাণীর কাছে আলোটি রেখে আমি একটা ছোট ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পেছন থেকে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন কাণে এলো মনে কেমন একটা ভয় হওয়ায় হঠাৎ সেই দিকে তাকাতে সাহস হলোনা—তার সময়ও ছিল না সেই মুহূর্ত্তে প্রবল একটা আলোড়নে আমার সারাদেহ স্পন্দিত হয়ে উঠলো ওঃ, সে কি হিংস্র পাশবিকতা ! আমার চোখে-মুখে কে একজন পুরু একটা কাপড় সজোরে বেঁধে ফেল্লে। তার পরই কণ্ঠ-আমার শব্দ-হারা আবৃত নয়নে সৃষ্টির গাঢ়তম অন্ধকার—আর সেই সঙ্গে বিশ্বাস ও বুঝি

রুদ্ধ হয়ে গেল। আর কিছুই মনে পড়েনা—বোধহয় সে-মুহূর্ত্তে দেহ মনের সমস্ত চেতনা হারিয়েছিলাম।

কতক্ষণ পরের কথা জনিনা। আকাশের ক্ষীণ চাঁদ তখন অস্ত গেছে। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এলো। সমস্ত সৃষ্টি বুঝি জমাট অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে আছে। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন কত বড় দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আমার সর্ব্ব অবয়বে এ কিসের অনুভব—কার স্পর্শ আমার ললাটে, বুকে? আর আর উঃ, কী সে দুঃসহ স্মৃতি।

কেনই বা হায় চেতনা ফিরে এল! সেই মুহূর্ত্তে যদি মরণ হতো তবে ত আর সারা জীবন এ নিগ্রহ ভোগ—এই অনুশোচনার অনলে পুড়ে মরতে হতো না। মনে পড়ে—নদীর জলের সেই অস্পষ্ট ছল্ ছল্ শব্দ, তারই বুকে একটা ক্ষুদ্র নৌকায় আমি লুণ্ঠিতা—একান্ত অসহায়া-বন্দিনী। লম্পটের সে পাপ স্পর্শে আমার সমস্ত মনুষ্যত্ব যেন লোপ পেয়ে ছিল—চিন্তা করবার শক্তিটুকু অবধি ছিল না—স্থানুর মতই পড়ে রইলাম। পাপীষ্ঠ অবশেষে নিজেই আমাকে তার পাপ আলিঙ্গন থেকে মুক্তি দিল। আমি যথা সম্ভব দূরে সরে গেলাম। নিজের অবস্থা ভালরূপে উপলব্ধি করবার মত শক্তিও তখন ছিলনা। একি সত্য-না স্বপ্ন?

ঘুরে ফিরে শুধু একটি চিন্তায়ই মনে আসছে—কোন

দশ্বির কবলে পড়েছি—কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্ছে? কিন্তু আর কোন কথাই ভাবতে পারছি না। এমন কি শ্বাস প্রশ্বাস নিতেও ভয়—আবার বুঝি দস্যু আক্রমণ করে। অন্ধকারে কার হাত এসে আস্তে আস্তে আমার বা-হাত খানি ধরলে। ভয়ে আমি এতই আড়ষ্ট, শক্তি হলনা সরিয়ে নি। চাপা কণ্ঠস্বর শুনলাম, সুশীলা অত ভয় পেয়ো না। তোমায় ছুঁয়ে বলছি কোন কষ্ট দেবার জন্যে তোমাকে আনিনি—সব দুঃখ কষ্ট থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই তোমায় এনেছি। এখন হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না—শত্রু মনে করছো কিন্তু আমি জানি একদিন এ ভুল তোমার ভেঙ্গে যাবে, তখন বুঝতে পারবে আমি শত্রু, না, সব চেয়ে বড় বন্ধু!

কি নির্ম্মম পরিহাস—বন্ধু? এত বড় সর্ব্বনাস করে বন্ধু বলতে একটু বাঁধলোনা? কিন্তু আমার নাম ও কি করে জানলো? এ কণ্ঠস্বরও যেন কোথায় শুনেছি। আমারই পাশে কে এ লোকটা? অন্ধকারেও ওর দিকে তাকাতে ভয় হয়। আস্তে হাত খানি সরিয়ে নিয়ে চুপ করে পড়ে রইলাম—অত বড় নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে সাড়া দেবার মতো সাহস ও শক্তি আমার ছিল না।

কতক্ষণ এমনি করে কেটে গেছে জানিনা। চোখ মেলে যখন চাইলাম—অন্ধকারের যবনিকা তখন প্রায় সরে গেছে। নদীর স্তব্ধ জলে ভোরের অরুণ পরিস্ফুট। কিন্তু আমারই সম্মুখে ও কে রিয়াজ না? নিখিলদার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু রিয়াজ? বড়ই

না—বিশেষত তৃষ্ণায় তখন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল—তাই শেষ অবধি রাজী হ'তে হ'ল।

রান্না সংক্ষেপেই শেষ করে ছিলাম। তবু অহারাদি সেরে আমার নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ে এসে যখন প্রবেশ করলাম তুপুর তখন হেলে পড়েছে।

দীর্ঘ উপবাসের পর খাওয়ায়, অবসাদ এসে আমার সর্ব্বাঙ্গ কখন ছেয়ে ফেল্‌লো। চোখের তুটি পাতা যেন কত ভারী, রাজ্যের তুশ্চিন্তার গ্রাস থেকে আমাকে মুক্তি দেবার মানষে সকল ইন্দ্রিয় মিলে আজ যেন সড়যন্ত্র করেছে। মনেও নেই কখন নিজেকে নিঃশেষে তাদের হাতে সমর্পণ করেছিলাম। সুপ্তি যখন ভেঙ্গে গেল, তখন বেলা বেশী বাকী ছিল না। সে দিনকার সেই দীর্ঘ মুহূর্ত্তটি যেন আমার আজীবনের সুকৃতির দান। কি নিবিড়-নিশ্চিন্ত নিদ্রা—আমার জীবনে যদি তা অশেষ হয়ে দেখা দিত, তবে ত আর আজীবন অনুশোচনার এই বিশ্চিক দংশন জ্বালা সইতে হ'ত না।

ঘুম ভাঙ্গতেই সর্ব্বনাশের সেই জ্বালাময়ী স্মৃতি! অহর্নিশি এ'কি অসহ দাহন—এর বিরাম নেই। যতদিন বেচে থাকবো এ মর্ম্মান্তিক জ্বালা সয়েই চলতে হবে। স্মৃতির হাত থেকে পরিত্রান নেই—এ দাহনেরও বুঝি শেষ নেই।

তাই যতই চেষ্টা করিনা কেন, এ জ্বালাময়ী চিন্তার হাত থেকে নিজেকে কিছুতেই যে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারিনে। আর কোন্‌ মধুর কল্পনা দিয়েই বা এ তুশ্চিন্তার হাত

এড়াবো? ভবিষ্যতের আশায়—ভগবানের ধ্যানে? কিন্তু হায় আমার ভবিষ্যৎ—আমার ভগবান, সবই যে আমার ধর্ম্ম নাশের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অসতী কুলটা নারীর আবার ভবিষ্যৎ কী—ভগবান কোথায়? তার জন্য জীবন ব্যাপি হুতশ্বাস, আর মরণে অনন্ত নরক। উঃ, কী নির্ম্মম বিধিলিপি!

জানালার পাশে গিয়ে দাড়ালাম। মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে নিজের দৈন্য—নিজের পূর্ব্ব-স্মৃতি আরও যেন দুঃসহ বলে মনে হয়। বাইরে তখন শত বিহঙ্গের সুললিত কাকুলী সুরু হয়েছে। অদূরে বেণু বনের শ্যামল শীর্ষে বেলা শেষের সোনালী রশ্মী গোধূলির অভিষেক রচনা করেছে। এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্ভাবের পার্শ্বে এখন থেকে আমার আর স্থান নেই—জগতের আনন্দ কোলাহলের মাঝে সেবা, পূণ্য ও সাধনার কাজে আর আমার অধীকার নেই। আমার সারা অঙ্গে পাপ-পঙ্কিলতার ছাপ লেগেছে—আমি অসতী, আমি কলঙ্কিনী।

আমার অন্তহীন চিন্তা-ধারায় বাধা না দিয়ে দিনের শেষ রক্তিমাভাটুকুও যে কখন নিঃশেষে মিলিয়ে গেল, কখন যে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নিবির হয়ে এল, কিছুই মনে নেই। অকস্মাৎ দ্বারে শব্দ হওয়ায় চমক ভাঙলো—এক ঝলক আলো এসে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। অর্দ্ধ উদ্‌ঘাটিত দরজায় মুখ বাড়িয়ে রিয়াজুদ্দিন জিজ্ঞেসা করলো—আমি একবার ঘরে

ঠিক কতক্ষণ পরের কথা জানি না। চেতনা যখন ফিরে এলো—একখানি তক্তপোষের উপরে তখন আমি শায়িতা। ছোট নোংরা ঘর—ঘরে তখন আর কেউ ছিলনা, এবং দরজা বাইরের দিকে বন্ধ। আমি বন্দিনী।

উঠে পশ্চিমের ছোট একটা জানালার পাশে দাঁড়ালাম। অদূরে বনরেখার আড়ালে অপরাহ্নের সূর্য্য তখন ঢলে পড়েছে। যতদূর দৃষ্টি গেল অসংখ্য বৃক্ষ-শ্রেণী তাদের বিস্তৃতশাখা-পত্র-পল্লবে এ বাড়ী খানি যেন লোক-চক্ষুর আড়াল করতেই প্রয়াসী।

আমার জানালা খোলার শব্দ পেয়েই বোধহয় বর্ষিয়সী এক নারী ঘরে প্রবেশ করলো। অধর প্রান্তে কেমন কৃত্রিম হাসি—জিজ্ঞেস করলো, উঠেছো? তবু ভাল, আমরা তো ভেবেই সারা। কেমন আছ এখন?

ওর নামটা পরে শুনেছিলাম—আমিনা, ওর কথাবার্ত্তার এমনইএক বিশ্রি ধরণ যে, তা শুনে মন এতটুকুও আশ্বস্ত হলো না। আপন মনে সে অনর্গল কত কিই না বলে যেতে লাগলো—অবশ্যি তার অধিকাংশই রিয়াজকে কেন্দ্র করে। বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী ও কথায় পরিপাট্যে সেদিন আমাকে সে কত লোভই না দেখিয়েছিল—রিয়াজের মত এমন সঙ্গতিপন্ন অথচ এত সদাশয় লোক নাকি এ যুগে বড়ই দুর্ল্লভ। আমার নেহাতই সৌভাগ্য, তাই তার নজরে পড়েছি। তাদের বড়-লোকের সংসার, আমাকে সে রাণীর হালেই নাকি রাখবে। কাজেই আমার পক্ষে এখন ভয় কিংবা আপশোষ করা

মোটেই সাজে না। বিশেষতঃ আমার যখন জাতি ও ধর্ম্ম দুই-ই গেছে তখন তাদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করা ও তাদের সঙ্গে আহারাদি করাই উচিৎ।

সুদূর আকাশের গায়ে এক খণ্ড রঙিণ মেঘের পানে চেয়ে ছিলাম আমিনার এত কথার উত্তরে জানবার মত কোন কথাই মনে আমার ছিলনা। সে কিন্তু আমার নীরবতাকে সম্মতির সুলক্ষণ কল্পনা করে খুসী মনেই প্রস্থান করলো। যাবার সময় জানিয়ে গেল যে খাবার সব তৈরীই আছে আমি বল্লেই সে এনে দিবে।

— ৩ —

দুটো দিন নির্জ্জলা উপবাসে কেটে গেছে। শরীরের উপর কোনই দৃষ্টি দিইনি। ছন্নছাড়া চিন্তা আর অসহ্য পরিতাপ—তার আর বিরাম নেই—শেষ নেই। হায়. কি অভিশপ্ত জীবনই আমার! বিধবা হয়েই নিজের দুর্গতি বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈধব্য জীবনের অসীম যাতনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি। কতদিন কত উচ্চ আদর্শ ও মহৎ চিন্তা সজোরে সরিয়ে দিয়ে কি এক তীব্র দুঃখের অনুভূতি আমার মনের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করছে—ঠেকাতে পারিনি। তখন ভেবেছি আমার মত এমন অভাগিনী বুঝি আর কেউ নেই। কিন্তু

তখন ত আমার নিত্য নূতন বই ছিল—বড় সাধের সেই পাঠশালা ছিল, কিন্তু আজ?

শুধু তাই নয়—আরও ছিল, তখন আমার ধর্ম্ম ছিল, মর্যাদা ছিল, পবিত্রতা ছিল—কিন্তু আজ? আজ ত আর আমার কিছুই নেই। এ নিঃস্ব অপবিত্র জীবনের ভার কি করে বইব—কবে এর শেষ হবে? এ জীবন শেষ হলেও এ কলঙ্ক—এ পাপের ত বুঝি শেষ নেই। কি করে আর আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীদের এই কালোমুখ দেখাবো?

এমনি দুর্ণিবার বেদনা বুকে বয়ে দুটো দিন কাটলো। আমার সেই দীর্ঘ দিন ও বিনিদ্র রজনী অনুশোচনার উষ্ম শ্বাসে যেন তপ্ত হয়ে ছিল। তবু চিন্তা-অবশন্ন মনে মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ জাগতো—একি সত্যি? আমার এই সর্ব্বনাস এ কলঙ্ক কি সত্যি, না সপ্ন? ঐ ত আগের মতই আজও আকাশে চাঁদ উঠেছে—তারা ফুটেছে। প্রকৃতির নিয়ম কিছুই ত বদলায়নি, আমারই কি শুধু এত বড় সর্ব্বনাস হয়ে গেল? কার এক আকস্মিক ফুৎকারে আমার আশার প্রদীপ চিরদিনের মত নিবে গেল,—ধর্ম্মের আশ্বাস—সতীত্বের তৃপ্তিও জন্মের মত ঘুচে গেল। হায়, কার অভিশাপে?

— ৪ —

পরদিন খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হল, সে-আমি যেন আর নেই। সারা অঙ্গে সে কি অবসন্নতা, মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছিল—ভিতরে বুঝি শত শিখার আগুন জ্বলছে। দুটি পায়ে এক বিন্দু শক্তি নাই। উঠে দাঁড়াতেই মনে হল পৃথিবী যেন ঘুরছে। তাড়াতাড়ি মেঝেতে বসে পড়লাম। ভোরের আলো কখন দুটি চোখের সামনে মিলিয়ে গেল—অন্ধকারে সৃষ্টি বুঝি নিমেষে ঢেকে দিল।

কতক্ষণ অমনি পড়ে ছিলাম জানিনা। প্রভাতের প্রস্ফুট রোদ ঘরের শত রন্ধ্র পথে এসে তখন মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। কি একটা শব্দে চকিত হয়ে দেখলাম,—আমিনা ও তের চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে—উভয়ে মিলে একটা বাক্স ঘরের ভিতরে নিয়ে আসছে। ছেলেটির নাম ছমির একে এ' দুদিন দেখিনি বটে তবে ঘরে বসে ওর কথার আওয়াজ শুনেছি।

বাক্সটা খুলেই ছমির পরম আগ্রহে ভীতরের জিনিষ গুলো বার করে দেখাতে লাগলো। বিচিত্র শাড়ী, সেমিজ, তোয়ালে, সুগন্ধি তৈল ও সাবান, এমনি কত কিছু। খান কয়েক বই ও ছিল। বললে, এ সমস্তই তোমার জন্য—রিয়াজ পাঠিয়েছে।

আমার স্নান-আহারের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমিনা অনর্গল উপদেশ দিচ্ছিল। শেষে স্মরণ করিয়ে দিলো, তোমার জন্য

তো নূতন নূতন সব কিছুই আনা হয়েছে—এখন আর চান করতে কোনই অসুবিধা নেই, এই বেলা উঠে নেয়ে নাও দেখবে শরীরটা ভাল লাগবে।

সত্যি শরীর আমার বড়ই অস্থির লাগছিল—মাথা ঘুরছিল, তাই সেদিন আর মৌন অসম্মিত জানাতে পারলাম না। বললাম চল। সুগন্ধি তৈল বিধবার নিষিদ্ধ, কিন্তু উপায় নেই, চোখ মুখ বুজে তাই এক আজল তালুতে দিয়ে, একখানি তোয়ালে কাধে নিয়ে বললাম—চল।

আমার এই সুবুদ্ধি দেখে আমিনা বুঝি একটু খুসী হ'ল—বললে, কই শাড়ী নিলে না, চান করে পরবে কি?

কথাটা সত্যি, তবুও খানিকটা ইতস্ততঃ করতে হলো—পাড় ওয়ালা শাড়ী! কিন্তু উপায় ওতো আর কিছু ছিল না। অগত্যা একখানা মিলের শাড়ী তুলে নিয়ে হটাৎ টান মেরে তার পাড় ছিড়তে লাগলাম। কর কি, বলে আমিনা চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু ধরতে সাহস পেলোনা।

তার আপত্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করে নষ্ট-শ্রী শাড়ীখানা গুছিয়ে নিয়ে বললাম—চল।

দীর্ঘ দুটি দিন অনুশোচনার তীব্র অনলে অহরহ দগ্ধ হয়ে সেই প্রথম দিনের আলোয় গিয়ে দাড়ালাম। প্রতি পদক্ষেপেই ঘুরে পড়বার আশঙ্কা হচ্ছিল—এতই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। হায়, আমার এই নির্ব্বাসিতা বন্দিনী-জীবনের সমাপ্তি আর কত

দূরে—মুক্তি কোথায়? লুণ্ঠিতা সর্ব্বহারা আমি—দিনের ঐ অত্যুজ্জল আলো আজ কেমন দুঃসহ মনে হলো।

বাড়ীর পাশেই একটি পুকুর—তার একটা পঙ্কিল ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালাম! মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে সেদিন কতই যেন মলিন মনে হ'ল। এই সুনিপুণ বিশ্ব-সৃষ্টি—এর আলো, বাতাস, ছায়া—অনন্ত আকাশের ঐ স্নিগ্ধ নীলিমা, বনানীর শ্যামকমনীয়তা—সবই ঠিক তেম্নি রয়েছে, আর প্রকৃতির এই বিপুল ঐসর্য্যের মাঝখানে আমিই শুধু জীবনের সকল আনন্দ থেকে একেবারে নিঃস্ব বঞ্চিত। সারা জীবনের যত সংজ্ঞম—ব্রত, নিয়ম, উপবাস—সবই নিমেশে পণ্ড হয়ে গেছে। এই দু'দিন আগেও আমার যা ছিল—মান, সম্ভ্রম, তৃপ্তি—আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই—আজ আমি কলঙ্কিনী।

জলে নেমে দু'টি ডুব দিয়ে অভ্যস্ত নিয়মে যুক্তকরে সূর্য্যদেবকে নমস্কার করতে গিয়ে সহসা আপন মনে শিউরে উঠ্লাম। বিধর্ম্মীর কাম-স্পর্শে যার সর্ব্বস্ব অপহৃত, ঐ তেজ-দৃপ্ত পবিত্র দেবতাকে বন্দনা করবার অধীকার তার কোথায়? হায় গত জন্মে কি মহাপাপই না জানি করে ছিলাম, তাই এ জন্মে বালিকা বয়সেই স্বামী সৌভাগ্য এবং পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েও তার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়নি। অবশেষে মান-সম্ভ্রম, ইহ-পরকাল সবই গেল, তবে এই অভিশপ্ত জীবনের প্রয়োজনই বা কি।

আমার অন্তরের দুর্নিবার বেদনা দুটি চোখ দিয়ে অশ্রু

রূপে কিঞ্চিৎ বেরিয়ে এল। স্তব্ধ ক্রন্দনে সারা বুক বড়ই যেন ভারী হয়ে ছিল।

আমিনা কখন লক্ষ্য করেছিল—রুষ্ট কণ্ঠে বললে, তুমি নাহক্ কেন কাঁদছো? রিয়াজ তো তক্‌লিফ্ দেওয়ার জন্যে তোমায় আনেনি তোমাকে সে কত ভালবাসে। তোমার জন্যে জান্‌ও দিতে পারে। কত সুন্দর সুন্দর চিজ্ কিনে এনেছে সবই তো তোমার জন্যে। তোমার ঘরে গেলে পাছে তুমি গোসা কর, তাই সে বারান্দায় শুয়ে রাত কাটায়। রোজ সাঁঝের বাদে বাড়ী থেকে সাইকল্ গাড়ী চেপে এ-গাঁয়ে আসে, তারপর রাত থাকতেই আবার ফিরে যায়। নইলে লোকে যদি তাকে বাড়ীতে দেখতে না পায়, তবে যে তাকেই সন্দেহ করবে। তোমার জন্যেই তো তার এত মেহন্নৎ, নইলে অমন বাপের বেটা, তার দুখ্‌খু কিসের?

তার কথায় সাড়া দেবার প্রবৃত্তি হল না, নীরবে স্নান শেষ করলাম।

আমিনা আবার সুরু করলে, দেখ, যদি নেহাৎই আমার রান্না না খাও, তবে নিজেই দুটি তৈরী করে নাও না। তোমার জন্যে সব কিছুই নূতন করে আনা হয়েছে। তবে আর মিছে কেন কষ্ট পাও—না খেয়ে মানুষ ক'দিন বাঁচে?

স্নান সেরে আমিনার সঙ্গে আবার সেই বন্দী-গৃহে ফিরে এলাম। এ বাড়ীর চারিদিক্ বুঝি বড়ই নির্জ্জন। সম্মুখের ঘন-বৃক্ষশ্রেণীতে ছোট একটা ফাক—তাই দিয়ে দূর মাঠের

একটু অংশ চোখে পড়ে। সেখানে যূথ-ভ্রষ্ট একটি গরুকে তার রাখাল তাড়া দিয়ে ফিরছিল। তার পরই আবার বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্টির সীমা অবরোধ করে বিরাজিত।

এমন কোলাহল বর্জিত জন-বিরল দেশ আর ত দেখিনি। এ কোন জায়গা,—এখান থেকে আমাদের বাড়ীই বা কতদূরে কোন পথে যেতে হয় ? এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের কি কোনই উপায় নেই ? যদি বা কোন দিন পালাতে পারি, কিন্তু পথ চিনে নিজেদের গ্রামে পৌছিবো কি করে ?

হঠাৎ চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়ে আমিনা বললে—যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। আগে মেটে কলসীটি নিয়ে পুকুর থেকে জল নিয়ে এসো গে, তারপর রান্না চাপাবে। দেখতেই পাচ্ছ তোমার জন্য সবই নূতন করে আনা হয়েছে—আখা অবধি কালকের তৈরী। রিয়াজ বলেছে, তোমার রান্না-খাওয়া হয়ে গেলে এঘরে তালা মেরে চাবী তোমার কাছেই রাখতে, বুঝলে ?

তার কথার উত্তর না দিয়ে নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম কি করা উচিৎ ? কতকাল এমন ক'রে এখানে কাটাতে হবে কে জানে ? এখনই তো উপবাসে সারা দেহ অবসন্ন, এরপর যদি শয্যা আশ্রয় করতে হয়, তবে ওদের হাতেই নিজেকে সমস্ত দিকদিয়ে সপে দিতে হবে। সে দুর্দিন যদি সত্যি আসে, তবে 'তো নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার পথ পাবোনা তখন ? কিন্তু আমার শ্রান্ত দেহ-মনে এ সব চিন্তা বেশীক্ষণ সইলো

স্তম্ভিত হলাম—ঐ তবে আমার সর্ব্বনাশের নায়ক, ওরই এমন স্পর্দ্ধা এই বিশ্বাসঘাতকতা ? কিন্তু নিজের দৃষ্টিকেও যেন বিশ্বাস হয় না। দুটি চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে এলো, একদিন ঐ লোকটাকে আমি কত উদার কত পরোপকারিই ভেবেছিলাম।

পূবের আলো তখন নদীর বুকে হেসে উঠেছে। মনে নেই স্তব্ধ হয়ে কি ভাবছিলাম—হয়ত কিছুই ভাবছিলাম না। তবু তীরে নৌকা ভিড়তেই চকিত হলাম—নিজের শোচনীয় বন্দি অবস্থার কথা মুহূর্ত্তে স্মৃতি পথে জেগে উঠলো; উ কি তার জ্বালা!

রিয়াজ উঠে—দাঁড়িয়ে বল্লে, চল সুশীলা আমাদের এখন নামতে হবে। তার ঐ কথায় শিউরে উঠলাম—নামতে হবে! নেমে কোথা যাব ওর সঙ্গে? নিখিলদার বোন আমি, হিন্দু-বিধবার আদর্শ জীবন বয়ে বেড়াব এইছিল সঙ্কল্প—কে তাতে বাদ সাধলে? মুহূর্ত্তে কে আমার সর্ব্বাঙ্গে অশুচির ঘন-কালিমা ঢেলে দিলে? এ কলঙ্ক যে মুছবার নয়—এ পাপের যে ক্ষয় নেই এত বড় সর্ব্বনাশ করে আবার আমাকে সঙ্গে যেতে ডাকছে—কি নির্লজ্জ।

আমার সাড়া না পেয়ে আবার ও সে ডাকলে, মিনতি নম্র কণ্ঠে বল্লে—এস, এরপর রোদ উঠে যাবে যে।

ওর স্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে ছিলাম। নিখিলদার বন্ধু হয়েও আমার সর্ব্বনাশ করতে ওর বাধেনি! ওর প্রতি আমাদের এত যে বিশ্বাস, এমন করে তার মূলোচ্ছেদ

করেও ওর মনে এতটুকু অনুশোচনা জাগেনি, তাই অম্লান বদনে আবার আমাকে ডাকছে ওর সঙ্গে যেতে। এত বড় নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে বলবার ভাষাও যে নেই—মাথা নেড়ে শুধু জানালাম, আমি যাবোনা—কিছুতেই না।

প্রথমটায় সে বোধহয় একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে তা সামলে নিয়ে বল্লে—পাগ্‌লামো করোনা সুশীলা। এতদিনের চেষ্টায় এত খানি কষ্ট করে তোমায় যে নিয়ে এসেছি, সে কি এই নৌকায় ছেড়ে যাওয়ার জন্যে? আর দেরী করোনা—দেরী করোনা—দেরী হলে বিপদ ঘটতে পারে। যদি স্বেচ্ছায় না যাও আমার সঙ্গে লোক আছে।

তার কথা শেষ হতে না হতেই বীভৎস চেহারার একটা লোক নৌকার কোন্ আড়াল থেকে উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো। লোকটাকে দেখেই সারা-দেহ-মন শিউরে উঠলাম। হায়, ঐ পাশবিক শক্তির কাছে আমার সঙ্কল্প যে একেবারেই মিথ্যা। একান্ত নিরুপায় শেষ অবধি তাই যেতেই হল। মনে নেই তাদের সঙ্গে কতটা পথ হেঁটেছি। আর আকাশ পাতাল কত কিই যে ভাব্‌ছিলাম তার ও খেয়াল ছিল না।

অনেকক্ষণ থেকেই মাথাটা ধরেছিল। পথ চলতে চলতে হটাৎ শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল বোধ হল এবং বুকের স্পন্দনও যেন বড়ই দ্রুত হতে লাগ্‌লো। তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না—দৃষ্টির সম্মুখে যেন সৃষ্টির অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

আসতে পারি? কয়েকটি কথার দরকার বলেই চলে যাবো—কোন ভয় নেই।

পাপীষ্ঠ ঘরে আসবে ভাবতে ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। আমি তার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিলাম না। ভয়ে সারা অন্তর ভরে উঠলো—ওর মুখে অনুরোধের কথা! যে নাকি হিংস্রতার প্রতিমূর্ত্তি—সংজ্ঞাহারা অসহায়া নারীর উপর যে তার পাশবিক লিপ্সা চরিতার্থ করতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না, তার মুখে ছলনার এ হীন আবরণ কেন? উত্তরের প্রবৃত্তি ছিলনা, অধোমুখে নীরব হয়ে রইলাম।

সে আবারও তেমনি সাড়া জানালো, কিন্তু আমার সম্মতির কোন লক্ষণ না দেখে অগত্যা আলোটি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। হারিকেনটি মেজেতে রেখে একবার এদিক সেদিক চাইলো, তারপর ট্রাঙ্কটি তক্তপোষের আরও একটু কাছে টেনে এনে তার উপর বসে পড়লো!

রিয়াজ ঘরে ঢুকতেই আমি বিছানা থেকে নেমে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে বললো—আমাকে অত ভয় করোনা সুশীলা? জানি তোমার কাছে আমি গুরুতর অপরাধ করেছি, কিন্তু তুমি জাননা সে জন্য আমি আজ কত লজ্জিত! এ দু'দিন তাই এত কাছে থেকেও তোমার সঙ্গে দেখা অবধি করিনি। কিন্তু কি করবো বল, যা হয়ে গেছে তা ফেরাবার তো কোন উপায় নেই। তবে ভগবানের দিব্বি দিয়ে বলছি, এরপর আর কোন অভদ্রতাই করবো না তোমার সঙ্গে।

তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটিবার খাটে এসে বসে আমার কথা ক'টি শোন, তারপর আমার বিচার কর। আমার সুখ দুঃখ এখন তোমার উপরই নির্ভর করছে, কৈ তুমি এসে বসো, নইলে অত দূর থেকে আমি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবো না—এসো।

এই বলে সে উঠে দাড়ালো। পাছে স্পর্শ করে—হাত ধরে টেনে নিয়ে বসায়, সেই ভয়ে জড়সড় হয়ে আমি নিজেই গিয়ে খাটের এক কোনে বসলাম। রিয়াজুদ্দিন বলতে লাগলো—আমি জানি সুশীলা, তোমার কছে আমি কত অপরাধী। তোমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করবো ভেবেছিলাম, করে ফেলেছি তার বিপরীত—এতই অপদার্থ আমি। কিন্তু কি করবো বল, আমি যে প্রথম দেখে অবধি তোমায় ভালবেসেছি। সে ভালবাসা এ'কয় বছরে তিল তিল করে বাড়তে আমাকে একেবারে পাগল করে তুলেছে। যাকে এমন ভাল বেসেছি, নিজের হাতে তাকেই এত বড় আঘাত দিয়েছি ভাবতেও আমার নিজের উপর ধীক্কার জাগে। কিন্তু এ ছাড়া বুঝি উপায়ও ছিলনা। তোমাকে পাওয়া তো দূরের কথা, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলাওতো আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তোমাদের চোখে আমি যে হীন মুসলমান। কিন্তু মুসলমানও যে তোমাদেরই মতো মানুষ, 'তোমাদেরই মতো সেও যে বাঞ্ছিত জনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করতে পারে, এ বিশ্বাস হয়তো তোমার নেই। তবু আমি নিশ্চয় জানি, আজ তুমি আমায়,

যাই ভাবো না কেন, এ ভুল চিরদিন থাকবে না। একদিন নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে আজ রিয়াজকে যত হীন বলে ভাবছো সে তা নয়। তার অপরাধ সে তোমায় ভালবেসেছে তোমার এমন রূপ যৌবন সে ব্যর্থ হতে দেয় নি।

ক্ষণকাল আমার মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে তেমনি আকুল কণ্ঠে আবার বলতে লাগলো—তুমি ভেবোনা সুশীলা যে শুধু খেয়ালের ঝোঁকেই জুলুম করে তোমায় নিয়ে এসেছি—খেয়াল মিটে গেলেই আবার আবর্জ্জনার মতো ছুড়ে ফেলে দেবো। সে আমি নই—এ জীবনে এ খেয়াল আমার মিটবেনা—কোন দিনই না। প্রথম যে দিন তোমায় দেখি—বিধবা হয়ে কচি বয়সে নিখিলদের বাড়ী চলে এলে—সেদিন থেকে এই ক'বছর রাত দিন শুধু তোমারি ধ্যান করেছি। তোমার মুখের হাসি, চোখের চাউনি দেখবার জন্য—তোমার প্রাণ মাতানো কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য—কতদিন কত জায়গায় আড়ি পেতে রয়েছি। সে সব কথা তুমি যদি জানতে, তবে হয়তো আমার অপরাধ এত বড় করে দেখতে না। তাছাড়া নিখিল ও অখিলের কাছ থেকে কৌশলে তোমার বিষয় কত কি জেনে নিয়েছি। তুমি কি রকম বই পড়তে ভালবাস জেনে নিয়ে সে সব বই কল্‌কাতা থেকে আনিয়ে কত আগ্রহে তাদের ধার দিয়েছি—তুমি পড়বে বলে। সে সব বইএর গায়ে তোমার স্পর্শ লেগেছে বলে তাদের আমি বুকে চেপে ধরেছি,

তুমি পড়েছ বলে নিজেও সে সব পড়েছি—আর তারাই হয়েছে রিয়াজের প্রধান সম্পদ।

তারপর তোমার মামা নিখিলের অসুখে ঢাকায় চলে গেলেন। তিনটি রাত আমি অন্ধকারে চুপি চুপি তোমাদের বাড়ী পাহারা দিয়েছি। সেদিন তোমাদের ঘরের পীছনে দাঁড়িয়ে যখন শুনলাম, কল্যাণী পায়খানায় যাবে আর তুমি যাবে তার সঙ্গে, তখন মুহূর্ত্তে মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হলো এইতো অপ্রত্যাশিত সুযোগ! আজকের এ সুযোগ যদি ছেড়েদি তবে আপশোষ হাহাকারেই সারাটা জীবন কাটাতে হবে। এতদিন বসে বসে যে সব আকাঙ্খা করেছি তার কণামাত্রও কোন দিন সফল হবে না; কিন্তু অসীম সাহসে বুক বেধে যদি তোমাকে নিয়ে কোন রকমে সরে পড়তে পারি, তাহলে এতদিনকার ব্যর্থতা আপশোষ সব ঘুচে যাবে—দুজনকারই জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।

সঙ্গে যে বিশ্বাসী চাকরটা ছিল তাকে আমার সঙ্কল্প জানালাম—সে রাজী হলো। তারপর কি হলো তুমি জানো। আমি যা করেছি তোমার চোখে সে হয়তো অমার্জ্জনীয় অপরাধ, কিন্তু নিজেও আমি কম ভাবিনি। তোমার স্বামী যদি বেচে থাকতেন, তোমার জীবন যদি সুখের হতো—স্বামীর ভালবাসা তার সঙ্গ যে কত সম্ভোগের তা যদি তুমি জানতে—তাহলে হয়তো একাজ আমি করতামই না। কিন্তু সে সুখত তোমার নেই—তোমার এমন রূপ যৌবন তো নষ্টই হয়ে যাচ্ছিল।

তাই তোমায় নিয়ে এসেছি—জবরদস্তি করে উপভোগ করবার জন্য নয়—তেমন লোক আমি নই—তোমায় বে করে তোমাকে নিয়ে ঘর সংসার করবার জন্য—দুটি ব্যর্থ জীবন সার্থক করবো বলে, বল অন্যায় করেছি ?

আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসি না—তার ছায়াও মাড়াই না। তাকে আমি তালাক্ দিয়ে দেবো, আগে আমাদের বে'টা হয়ে যাক্। তুমি হয়তো ভাবছ, আমি নেহাতই তোমার অযোগ্য। কিন্তু তোমায় ভালবেসে অবধি এই ক'বছরে আমি অনেক বই পড়েছি, তোমার যোগ্য হবার অনেক চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা যদি আমার একেবারেই বিফল হতো, তাহলে কি আর তোমাকে হাতে পেয়েও এই ক'দিন দূরে সরে থাকতে পারতাম। তবে সেদিন তোমার অজ্ঞান অবস্থায় যা করে ফেলেছি, সে আমার দারুণ কলঙ্ক। জানি ওতেই আমি তোমার চোখে কত হীন হয়ে গেছি। তবে কি জানো, তোমায় ধরাধরি করে নৌকায় নিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চলে যেতেও যখন তোমার জ্ঞান হলো না, তখন সত্যি আমার ভয় হলো। জ্ঞান সঞ্চার করবার জন্য তোমাকে ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে আমারি সমস্ত জ্ঞান, সব মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে গেলো। হয়ত মনে হয়েছিল যে বে করবার জন্যই যখন তোমায় এনেছি, তখন দু'দিন আগে আর পরে কি এসে যায়।

সে দিন যে অন্যায় করে ফেলেছি তাতো স্বীকারই করেছি। কিন্তু সে অপরাধ কি আমার এতই বড় যে তার ক্ষমা নেই ?

ভেবে দেখো যে আমি তোমায় যেমন ভালবেসেছি, তেমন ত আর কেউ বাসেনি। তোমায় পাওয়ার জন্য আমি যেমন পাগল, তেমন ত আর কেউ হয়নি। এ ভালবাসার কোন প্রতিদানই তুমি দেবে না? আমার অপরাধ যত বড়ই গোক্ না কেন, একথা ভুলোনা যে তোমাকে একান্ত নিজের করে নেওয়ার জন্যই সে অপরাধ। তাছাড়া যা হয়ে গেছে তা যখন আর কিছুতেই ফিরবে না, তখন কি চীরদিনই তুমি অসতীত্বের ছাপ নিয়ে থাকবে? না সুশীলা, তা তুমি পারবে না। তাহলেই ভেবে দেখো যে এই ছাপ মুছে ফেলবার একমাত্র উপায় আমাকে বে করা, আর যত শিগ্গির তা হয়ে যায় ততই মঙ্গল—দু'জন কার পক্ষেই সুবিধে। তাছাড়া তোমার যখন জাত গেছে, সতীত্ব নষ্ট হয়েছে তখন তো আর বাড়ী ফিরে যেতে পারছো না, কাজেই যে দিক দিয়েই দেখো না কেন—এছাড়া আর উপায় নেই।

যাক্, তুমি নিজের মনে একবার ভেবে দেখো এছাড়া আর কি প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু এমনি করে আর সময় নষ্ট করো না। তোমায় কাছে পেয়েও দূরে সরে থাকার যে কি যাতনা তা যদি তুমি বুঝতে! যাক্ এই কথাই আমার বলবার ছিল- শিগ্গিরই আবার আসবো, তখন তোমার উত্তর চাই, বুঝলে? আজ তবে আসি—হাঁ ভালো কথা, তুমি যেন কোন বিষয়ে সঙ্কোচ করো না। তোমার যা কিছু দরকার আমিনাকে জানালেই পাবে। তোমার আচার বিচারেও কেউ

বাধা দিবে না। তোমার যাতে আর কোনই অসুবিধা না হয় সে আমি দেখবো, তোমার আর কোন ভাবনা নেই।

ক্ষণকাল আমার মুখের পানে চেয়ে রিয়াজ বল্লে—আমি তবে এখন আসি সুশীলা! হাঁ না আমি কিছুই বল্লাম না।

ধীরে ধীরে সে দ্বার প্রান্তে চলে গেল। তারপর হটাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—যাবার আগে তোমার মুখের সামান্য একটা কথাও কি শুনতে পাইনে সুশীলা? যাহোক্ একটি কথা বল।

বলবার মতো শক্তি তখন আমার ছিলনা। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল। আমার নিশ্বাস বুঝি এতক্ষণ বন্ধ হয়ে ছিল—সেই মুহূর্ত্তে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম।

রিয়াজের অনর্গল বাক্য-স্রোতে আমার মন কখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল—সে যা বল্লে তা তো কই পিশাচের মতো কথা নয়—তবে?

তার চলে যাওয়ার পর শূন্যদৃষ্টিতে কতক্ষণ যে ছোট জানালাটির পানে স্তব্ধ হয়ে চেয়েছিলাম জানিনা। আমার আশে পাশে, ঘরের সমস্ত রুদ্ধ বাতাসে তারই কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াচ্ছে—সে-দিনই বুঝবে সুশীলা, আমি তোমায় যেমন ভালবাসি তুমিও যেদিন আমায় তেমনি ভালবাসবে। আমার ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে যেন তা' মরমে গিয়ে বিঁধলো। সারা মনে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেকার তার সেই সহস্র কথা আলোড়নের পর আলোড়ন এনে দিল। দুর্ণিবার চিন্তার জোয়ারে আমার সমস্ত সংযমের বাঁধ বুঝি নিমেষে ভেসে গেল। বাত্যাতাড়িত বন্যার প্রবল উচ্ছ্বাসে আমার

ঝঞ্ঝাহত জীবন-তরণী দিশাহারা হয়ে যেন কোন অকূল সমুদ্রের পানেই না ভেসে চললো—তাকে ফেরাবার শক্তি আমার কোথায় ?

আমার বিক্ষিপ্ত মনকে প্রাণপণে সংযত করতে চাইলাম। এত বড় সর্ব্বনাশের পরও আবার পাপ চিন্তা মনে আসে কেন ? ভাগ্য দোষে অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে যে পাপের ভাগী হয়েছি তারই তো প্রায়শ্চিত্য নেই, এ আবার কোন মোহ-জালের ঘূর্ণিপাকে আমায় জড়িয়ে নিতে চলেছে। আমি মুক্তি চাই—শুধু মুক্তি চাই। সে পথের সন্ধান আমায় কে দেবে সে শক্তি আমি কোথায় পাবো—কোথায় ?

ধীরে ধীরে মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুঞ্জীভূত অন্ধকারে তখন চারদিক্ ছেয়ে গেছে। আকাশে কয়েকটি নক্ষত্র ভিন্ন আর কোথাও কিছুই দৃষ্টি গোচর হলো না। কোথাও একটি আলো নেই—জন মানবের সাড়া-শব্দ নেই ; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন—নিস্তব্ধ নীরব। আর কি নিথর বাতাস—পত্র পল্লবেও বুঝি তার ক্ষীণ স্পর্শ বাজেনা।

অবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সে বিরাট স্তব্ধতা আমার নির্ব্বাসিত জীবনের চরম বিভীষিকা হয়ে যেন সেদিন দেখা দিল। অবশ দেহে অগ্নি-শয্যায় গিয়ে লুটিয়ে পড়লাম, কিন্তু নিস্তার আমার কোথাও নেই। বাইরে ঘণিভূত অন্ধকার, আমার অন্তরাকাশেও তাই ছেয়ে এল। শত চিন্তার তীক্ষ্ণ তীর বুকে এসে বিঁধতে লাগলো—কী দুঃসহ তার জ্বালা।

এত দিন পরে আমার রিক্ত বৈধব্য-জীবনের বেদনার অনুভূতি যেন স্পষ্ট হয়ে বুকে বেজে উঠলো। সারা জীবনে শুধু পুঞ্জীভূত দুঃখ-নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধ হাহাকার—তার বিরাম নেই অবসানও নেই। কি নিষ্ঠুর অভিশাপ! চির-ব্যর্থতার মর্ম্মান্তিক বেদনা বুকে বয়েই দিনের পর দিন সমাপ্তির প্রতীক্ষায় কাটাতে হবে। এর কোনই প্রতিকার নেই। আমার বেদনা-বিক্ষিপ্ত মনের উপর আজ আর কোন ক্ষমতাই টিকলোনা—সমস্ত সঙ্কল্প কখন ধূলায় মিশে গেল। দুটি চক্ষু বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এল। আমার আশা-হত ব্যর্থ জীবনে এই যে এক কলঙ্কময় অধ্যায় আরম্ভ হলো, এর শেষ কোথায়, পরিণতি কিসে?

রিয়াজের সেই কথা গুলো আবার প্রতিধ্বনিত হয়ে এল—স্বামীর ভালবাসা, তার সঙ্গ, দাম্পত্যের মাধুর্য্য—সে যে কত বড় তৃপ্তির, তার কোন আস্বাদই তো আমার জীবনে পাইনি। সে সৌভাগ্যের সামান্য অভিজ্ঞতাও যে আমার নেই। চির-বঞ্চিত নারীত্বের সমস্ত আকাঙ্খা সঙ্গোপণে চেপে নিয়ে নির্ব্বিকার-চিত্তে পথ চলতে হবে—হৃদয় বিদির্ণকারি শত বিলাপ হৃদয়েই অবরুদ্ধ রাখতে হবে। দুঃখের সঙ্গে যার অবিছিন্ন সম্বন্ধ, দুঃখ প্রকাশও যে সেই বাল-বিধবার পক্ষে লজ্জার কথা—ওতে যে তার অসংযমের পরিচয় পাওয়া যায়! হায়, এতই কঠিন বিধবার জীবন!

তবু ত অকাল-বৈধব্যের নিষ্ঠুর অভিশাপ মাথা পেতে নিয়ে চলেছিলাম! ব্রত, নিয়ম ও উপবাসে আমার সর্ব্ব-রিক্ততার

বেদনা-বোধ অনেকখানি চাপা পড়েছিল। তাছাড়া তখন আমার কল্পনার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল, অতি সাধের পাঠশালা ছিল, পড়া-শোনার সর্ব্ব-ভোলা-আশ্রয় ছিল। অলস অবসরে, নিশুতির বিনিদ্র শয্যায় কত জাগর-স্বপ্ন, কত সুখ-সৌধ-মালাই না সৃষ্টি করেছি। সেই কল্পনা স্রোতে ভাষতে ভাষতে কত দূরে, যেন কোন নূতন জগতে গিয়ে পৌঁচেছি। তখন মনে হয়েছে, আমার বৈধব্য নিদালি-রাতের একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন শুধু—নিশান্তের জাগরণের সঙ্গে তারও যেন সমাপ্তি ঘটবে। সকলের মতো আমার ভবিষ্যতেও যেন আশা-আনন্দ সার্থকতার অনন্ত সঞ্চয় রয়েছে—তার স্পর্শে আমিও একদিন সার্থক হবো ধন্য হবো।

কিন্তু আজ? আমার জীবনের নব-স্ফুট প্রভাত বেলার সেই সৌন্দর্য্য টুকুও কোথায় অন্ধকারে নিলিয়ে গেছে। দৃষ্টির সম্মুখে রইল দিগন্ত-ব্যাপী ঘণ কৃষ্ণ যবণিকা-ছায়া—তার বুঝি সীমা নেই, শেষ নেই।

রিয়াজ বলেছিল—তোমার জাত যখন গেছে, সতীত্ব নষ্ট হয়েছে, তখন ত আর বাড়ী ফিরে যেতে পারছো না।

সত্যি কি তাই? আমি আর কোন দিনই বাড়ী ফিরে যেতে পাবো না—মাকে আর কখনো দেখতে পাবো না? সে কি হয়—সে যে অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি ত আর নিজের ইচ্ছায় এ পাপ করিনি। রিয়াজের কথা! ত সে আর আমার মাকে তেমন জানেনা তাই ওকথা বলে। মার যে

আমার আর কেউ নেই—আমাকে ছেড়ে কি মা থাকতে পারেন! এই ক'দিন কি করে না জানি তার কেটেছে! আমি তো তবু দুটো মুখে গুজে বেঁচে রয়েছি—কিন্তু তিনি? আহার নিদ্রা সবই বুঝি ঘুচে গেছে তার। আমারি শোকে হয়তো পাগল হয়েছেন—দুটি চোখে হয়তো অবিরল অশ্রুর ধারা ঝরে পড়ছে—কে জানে আর কি হয়েছে! না, আর ভাবতে পারিনে, কি সর্ব্বনাশী মেয়ে হয়েই না জন্মেছিলাম—আমার আবির্ভাবে একে একে সব গেল। নিখিলদাও হয়তো বেঁচে নেই, মা-ও বুঝি শেষ শয্যা নিয়েছেন।

পরদিন রিয়াজ যখন আমার ঘরে এসে দাঁড়ালো, সন্ধ্যা তখন অতিক্রান্ত পশ্চিমাকাশের সোণালী মায়াটুকুও বনান্তরালে কখন মিলিয়ে গেছে। ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে সুদূরের খণ্ড ধূসর মেঘ-মালার পানে নির্ণিমেষ-নয়নে চেয়েছিলাম। সারা মনে চিন্তার অনিরুদ্ধ প্রবাহ বয়ে চলেছিল—মনেও নেই দুটি চোখে কখন অশ্রুর প্রবাহ নেমেছে।

রিয়াজের ব্যাথাতুর কণ্ঠস্বর কাণে এসে বাজলো—ওকি তুমি কাঁদছো সুশীলা? আমি তোমায় বে করবো জেনে, আমার এত ভালবাসা পেয়েও কি তোমার দুঃখ ঘোচেনি? আচ্ছা বলতো, এমন কোন সুখ থেকে তোমায় আমি বঞ্চিত করেছি! তুমি এতদিন যে দুঃখ পাচ্ছিলে চিরদিন তাই পেতে হতো—আমিইতো তা থেকে তোমায় উদ্ধার করেছি! সে কি আমার এতই অপরাধ! আমাকে বে করলে তোমার ভবিষ্যত

যে অতীতের চেয়ে লক্ষ্যগুণ সুখের হবে তা বুঝতে পারছো না? আমাকে দেখলে এখনও হয়ত তুমি ভয় পাও, বিরক্ত হও, কিন্তু তোমাকে একটিবার দেখবার জন্য আমি যে সারাটা দিন ছট্‌ফট্‌ করে কাটাই, আর সন্ধ্যা হলেই আট্‌ক্রোস রাস্তা সাইকেল্‌ চালিয়ে আসি- দয়া হয়না একটু? আজও আমায় শত্রু মনে করে কত ভয় কত কষ্ট পাচ্ছ।. কিন্তু একটিবার যদি নিজের বলে বিশ্বাস করতে পার—এতটুকুও ভালবাসতে পার—তাহলে তো চোখের নিমেষেই এই দূরও ঘুচে যায়—সকল কষ্টের অবসান হয়! তোমার ঐ চোখ, মুখ, হাসি দেখে আমি যে চিরদিনকার মতো তোমার কেনা গোলাম হয়ে গেছি সুশীলা! তুমি যে আমার বুকে করে রাখবার ধন আজও দূরে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলার যে কি যাতনা তাকি তুমি বুঝবে না? আজ তুমি যাই ভাবো না কেন, এমন দিনও আসবে যখন আমার জন্যও তোমার দরদ হবে। তখন বুঝতে পারবে, কি সুখ থেকে এই ক'টি দিন তুমি বঞ্চিত হয়েছ, আর আমাকেও বঞ্চিত করেছ। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আর সময় নষ্ট করো না। আজ যদি তুমি বলো কালই আমাদের বে হ'তে পারে—সবই আমি ঠিক করে রেখেছি। তোমার সামান্য একটি কথায় সব দুরত্ত এক্ষুনি ঘুচে যেতে পারে—বল সুশীলা, তুমি রাজি? নিজেকে আর গোপন করে রেখোনা। আপনাকে সব দিক দিয়ে একবার ভেবে দেখো. তোমায় আমি তাড়াদিতে চাইনে, তাবলে

আমায় আর ভুগিও না ; দু'এক দিনের মধ্যে মন স্থির করে ফেল। তারপর দেখবে জীবনে সে কি আনন্দ—কি সুখ !

এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—আচ্ছা তবে এখন যাই পরশু আমি আবার আসবো, তার আগে তুমি মনকে তৈরী করে নাও। এ লজ্জার বাঁধ একবার ভেঙ্গে দাও তারপর দেখবে নূতন জীবন সুরু হবে।

সে দরজার দিকে এক পা এগিয়ে আবার থামলো। কিছুক্ষণ নীরবে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বল্লে—আমার পানে একটিবার তাকাও সুশীলা, একটি কথা বল। শুধু এইটুকু আমায় জানতে দাও যে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করেছ—আমায় ঘৃণা কর না।

তার স্বরে কেমন অনুনয় ও বেদনা মাখান ছিল যে মুহূর্ত্তের জন্য আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবা মাত্রই হটাৎ সে আমার দিকে ফিরে দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠলো সুশীলা কি সুন্দর চোখ তোমার।

রিয়াজের এই অদ্ভুত আচরণে ভীত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দূরে সরে গেলাম। সে যেন তখন একটু প্রকিতিস্থ হয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে বল্লে—আমায় ক্ষমা কর সুশীলা আমি পাগল, ঈশ্বরের নাম করে বলছি আর কখনও এমন হবে না। তোমার চোখ দেখলে আমি—না আর এখানে দাঁড়াবো না, নিজেকে বিশ্বাস নেই। এই দুটো দিন কাটাতে পারলেই বাঁচি।

— ৭ —

ভেবেছিলাম রিয়াজের কোন কথা, কোন মিনতিতেই কান দেবনা—প্রাণ-পণ বলে আপনাকে অন্য চিন্তায় নিমগ্ন রাখবো। কিন্তু তার কণ্ঠের আকুলতা ও অবেগময়ী ভাষা কখন যে আমাকে উৎকর্ণ করে তুললো—খেয়ালও হলনা। একবার মনেও এলনা তখন যে এরই পশুবলে আমি অপহৃতা—এরই লালসার ফলে সতীত্ব হারা।

রিয়াজ তার বক্তব্য শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে গেল—হয়ত কত আশাই বুকে বয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু আমার? কি এক অসহ্য বেদনায় হৃদয় ভরে উঠে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগলো। যে অসহনীয় ক্ষোভ—যে আকুল ক্রন্দনে রিয়াজুদ্দিন এসে বাধা দিয়েছিল তা যেন শতগুণ বেড়ে গেল। নিজের অসীম দুর্গতির স্পষ্ট ধারনায় মন আজ বড়ই উদ্বেলিত হয়ে উঠচে। আপন দুঃখে এমন অপরিসীম কাতরতা আরত কখনও অনুভব করিনি। ভগবানের এই বিশাল সৃষ্টির মাঝে আমার মত এমন অভাগিনী আর বুঝি কেউ নেই। অসহ্য যাতনায় নিমেষে ধূলায় লুটিয়ে পড়লাম—ওগো দেবতা, বুকে আমার বল দাও—এ দুর্ব্বহ জীবন আর ত বইতে পারিনে!

নীচের কঠিন ভূমি-শয্যায় উষ্ণ অশ্রুর প্লাবনে কি করে যে সেরাত কেটে গেছে ভাবতেও আজ সারা দেহ মন শিউরে

উঠে। আমার সে ক্রন্দন কারো কাণে গিয়ে পশেনি, একটা সান্তনার কথা বলতেও কেউ আসেনি। বাল-বিধবার হতাশ ক্রন্দনের নীরব রোল বিধাতার কাণে গিয়েও বুঝি পৌছায় না—মানুষ তো দূরের কথা!

যে পাপ চিন্তা কিছুতেই মনে আসতে দিব না ভেবেছিলাম, ঘুরে ফিরে তাই কেবল মনের সীমানায় হানা দিতে লাগলো। নিঝ্‌ঝুমরাতে কোন দূরের ভেসে আসা বাঁশীর সুরের মতো রিয়াজের কথা গুলো বারে বারেই যেন কাণে এসে বাজতে লাগলো—"আমি তোমায় যেমন ভালবেসেছি আর ত কেউ তেমন বাসেনি—আমি তোমার জন্য যেমন পাগল, আরত কেউ তেমন হয়নি।"

হায়, আমি যে বিধবা—কে আর আমায় ভালবাসবে? যার কাছে আমার ভালবাসার দাবী ছিল, তার সঙ্গে পরিচয় হতে না হতেই ত তিনি পরলোকে চলে গেছেন! উঠন্ত কৈশোরের যে কাল-মুহূর্ত্তে স্বামী হারিয়েছি, সেদিন থেকেই আমার সব গেছে—জীবনের সুখ সৌভাগ্য সার্থকতা সব কিছুই; মনের আকাঙ্খা সব মনেই লয় করে দিতে হবে। নূতন করে জীবন গড়া! না না, আমি যে নারী তাতে আমার কোনই অধিকার নেই—সে কল্পনাও আমার পাপ। আজ আমার ভালবাসা পাওয়া পাপ—ভালবাসা দেওয়া ততোধিক পাপ। আমার চারদিকেই যে পাপের বেড়াজাল—এ থেকে আমায় উদ্ধার কর ঠাকুর, উদ্ধার কর। আচ্ছা, যে ঐশ্বর্য্য

পৃথিবীর বুকে স্বর্গ সুখের অনুপম রূপ নিয়ে আসে, রিয়াজের নিবেদিত এই প্রেমই কি সেই ? সেত আমার স্বামী নয়, তবে তার কথাগুলি আমার মনকে এমনি করে দোলা দেয় কেন ? আমি দুর্ব্বল—আমি পাপী বলে ! স্বামীর প্রেম, সে না জানি আরও কত মধুর, কিন্তু আমার জীবনে ত সে অমৃতের আস্বাদন ঘটেনি। আবাহনের আগেই যে তার বিসর্জ্জন জন্মের পূর্ব্বেই যে তার সমাধি হয়ে গেছে। তবু এ পোড়া দেহে রূপ-যৌবনের এ অনাবশ্যক সঞ্চার কেন—কেন অন্তরের একান্তে যৌবনের মদির-স্বপ্ন-সুখের সুললিত ঝঙ্কার ? সৃষ্টির বুকে এই যে নিষ্ঠুর পরিহাস—তুষের আগুণে তিল তিল করে জীবনের এই যে অহর্নিশি দহন—বিধাতার একি নিষ্ঠুর খেলা !

আমার বঞ্চিত যৌবনে রিয়াজের আকুল মিনতির মোহ অকস্মাৎ যেন বিপ্লব এনে দিল। উদ্বেলিত মনকে সংজত করবার শত চেষ্টা সবই বিফল। রিয়াজের পাশবিক ব্যবহারের কথা ভেবে মন স্থির করতে গিয়েও অচকিতে যেন কানে আসে "তোমার মুখের হাঁসি চোখের চাউনি দেখবার জন্য—তোমার প্রাণ মাতানো কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য, কতদিন কত জায়গায় আড়ি পেতে রয়েছি।" হায়, কে কবে এ অভাগিনীর কথা এমনি করে ভেবেছে ! বিধাতা বিমুখ হয়ে যেদিন আমার সবখানি সুখের পসরা নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছেন, সেই দিন থেকে কারো কাছে ত এতটুকুও স্নেহের নিদর্শন পাইনি। বরং বেদনা-কাতর চিত্তে আত্মিয় স্বজন কি প্রতিবেশীর কাছে সহানুভূতির আশায়

গিয়ে, অনেক সময়েই ত হৃদয় হীন তাচ্ছিল্য পেয়েছি ; আর রিয়াজ ত অজাচিত ভাবে—ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ চম্‌কে উঠ্‌লাম। হায় ঈশ্বর, আবার সেই পাপ চিন্তা! বাবা যে স্বর্গ থেকে আমার সব কাজ, সমস্ত চিন্তাই দেখতে জানতে পাচ্ছেন—কি লজ্জা—কি কলঙ্ক! হায় রে এ পাপের বুঝি কোন প্রায়শ্চিত্তও নেই।

তখন রাজপুত বীরাঙ্গনাদের অক্ষয় কীর্ত্তি কাহিনী স্মরণ করতে লাগলাম—সেই পদ্মিনী, সংযুক্তা ও এমনি আরো কত শত বীর নারীদের অদ্ভুৎ আত্মত্যাগ—তাঁদের পুণ্য জহর ব্রত। নিখিলদা বলেছেন যে চিরদিনই বিশ্ব-মানব ভক্তি-আপ্লুত-নেত্রে সেই স্মৃতির কাছে মাথা নোয়াবে। আমিও তো সেই হিন্দুর মেয়ে, তবে হায় আমার আজ এ অধোগতি কেন? আচ্ছা, তাঁদের জীবন কি আমার মত নৈরাশ্যের ছিল? অকারণ কি লোকে তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখতো—অপমান করতো? সহমরণের প্রথাই কিন্তু ছিল ভাল। মরে গেলে আর কোন জ্বালা—কোন প্রলোভনই থাকে না। সহমরণের গৌরব থেকে—অকাল বৈধব্যের সকল সন্তাপ, সমস্ত বিপদ এড়াবার এমন সুযোগ থেকে—বিধবাকে যাঁরা বঞ্চিত করেছেন, তারা কি নিষ্ঠুর—কি পাষাণ!

এইরূপ এলোমেলো চিন্তায় বিনিদ্র নয়নে রাত যে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি নে, শেষ রাতে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন একটি বারও রিয়াজুদ্দিন এ বাড়ীতে এলো না—

তার পরদিনও না। আমার কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিন ও শান্তি হীন দীর্ঘতর রজনীগুলি তবুও কাটতে লাগলো। উদ্বেগ অস্থিরতায় আরও তিনটি দিন যখন কেটে গেল—উন্মনা হলাম। সন্ধ্যার প্রতিক্ষায় আমার অফুরন্ত দিনগুলিরও অবসান হতে লাগলো, এবং কি জানি কিসের আশায় গোধূলী থেকে রাত দুপুর অবধি উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম ; কিন্তু এর মধ্যে মুহূর্ত্তের সাক্ষাতের জন্যও ত কৈ রিয়াজ আর এলনা! তবে কি সে এত দীর্ঘ অবসর শুধু ভেবে দেখবার জন্যই আমায় দিয়েছে? এমন অধৈর্য্য লোক, এতখানি বিবেচনা তার! যাক্ .গিয়ে, সে না এলে ত ভালই, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাবো কেন?

একদিন জানালার পাশে বসে জীবনের অবশিষ্ট অধ্যায়ের পরিকল্পনা মনে মনে এঁকে চলেছিলাম। দূর বনান্ত রেখার ওপার থেকে সন্ধ্যার ধূসরতা তখন ঘনিয়ে এসেছে। দিনের বেলাই যেখানে জীবনের কোনও সাড়া পাওয়া যায় না, রাত্রি বেলা ত আমার সেই নির্ব্বাশন ভূমি শ্মশানের চেয়েও নিশ্চল নিস্পন্দ। এই পরিপূর্ণ নির্জীবতার মধ্যে আমার একমাত্র অবলম্বন কল্পনা ও চিন্তা, চিন্তা ও কল্পনা। এ ছাড়া আমার নিসঙ্গ বন্দিনী-জীবনের অবলম্বন আর কিই বা ছিল!

হঠাৎ রুদ্ধ দ্বারে শব্দ হ'ল। অন্ধকার ঘর—বিনা প্রয়োজনে আলো বড় একটা জালতাম না—তাই আমি চমকে উঠলাম। ঐ অন্ধকারেই অস্পষ্ট দেখতে পেলাম কে যেন একজন পুরুষ মানুষ ঘরে ঢুকছে। বুক দুর দুর করে কেঁপে উঠলো—

কিসের আশায়, কিসের ভয়ে মন ভীষণ আন্দোলিত হয়ে উঠলো। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই কাণে এসে বাজলো—কৈ গো, অন্ধকারে চুপটী করে কোথায় বসে আছ—এই নাও তোমার একটা চিঠি।

শয্যা প্রান্তে চিঠিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছমির তখনই চলে গেল। ছমিরের কণ্ঠস্বরে আমার সকল সংশয়, সবখানি চঞ্চলতা নিমেষে ঘুচে গেল। কিন্তু তবু না জানি কেন তা আজ ভাল লাগলো না; কাণে যেতেই মনটা বুঝি দমে গেল। আমার এই অভিশপ্ত জীবনে, যখন যে অবস্থায়ই পড়ি না কেন, কেবলই বঞ্চনা। নিমেষে মনটা কেমন বিষাদে ছেয়ে গেল। যে রিয়াজের বিরুদ্ধে আমার এত অভিযোগ, তার জন্যও মন কেমন শঙ্কিত হয়ে উঠলো। চিঠি কে লিখেছে—কি আছে ওতে! উদ্বিগ্ন হৃদয়ে চিঠিটা খুলে নিয়ে প্রদীপ জ্বাললাম। পেন্সিলে লেখা চিঠি ;—

সুশীলা ;—

বড়ই দুঃসংবাদ। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখিয়াছে। সেই জন্য এত দিনের মধ্যে একটিবারও তোমাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই। আগামী কল্য আমার বিচার হইবে—জানিনা কয় বৎসরের জন্য ঘানি ঠেলিতে দিবে! হায় ভগবান, আমার বড় সাধে বাদ সাধিলেন। তবে যদি তুমি আসিয়া কাল হাকিমকে বল যে তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়াছ, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খালাস পাইব—মোক্তার বাবু বলিয়াছেন। তোমার হাতেই

এখন আমার জীবন মরণ—আমাকে তুমি বাঁচাও সুশীলা, তাহাতে উভয়েরি লাভ। আর আমি যে তোমাকে এতখানি ভালবাসিয়াছি—তোমার জন্য এত কিছু করিয়াছি তাহারও প্রতিদান দেওয়া হইবে। মনে রাখিও তোমার জন্যই আমার আজ এই বিপদ—আমার যদি জেল হয় তাহা হইলে তোমার কি গতি হইবে? এই বিপদে আমাকে উদ্ধার কর সুশীলা, দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে তাহা কোন দিনই তোমাকে জানিতে হইবে না। আমাকে বিশ্বাস কর, বাঁচাও আমি চিরদিনই তোমার গোলাম হইয়া থাকিব। মোক্তার বাবুকে আমি বলিয়াছি তুমি নিশ্চয় আমাকে উদ্ধার করিতে আসিবে—দেখিও ভুলিও না। ইতি—

তোমারই

অভাগা রিয়াজ।

পুনঃ—আমিনাকে সমস্ত খবর পাঠাইয়াছি। কাল ভোরেই ছমিরের সঙ্গে রওনা হইবে, নচেৎ রৌদ্র ও গরমে কষ্ট পাইবে আসিতে। তোমার কোনও ভয় নাই, আমার উকিল মোক্তার খুব ওস্তাদ লোক, তারাই সমস্ত ঠিক করিয়া দিবেন।

রিয়াজ।

— ৮ —

সেদিন কতবার যে চিঠি খানি পড়েছি তার ঠিক নেই। আমার চোখে সমস্তই যেন হেঁয়ালী ঠেকছিল, আমার বিক্ষুব্ধ জীবনে আজ এ কী নিদারুণ সমস্যা! মনে পড়ে সারা রাত দূর আকাশের তারা গুলি যেন সহস্র দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে ছিল। দিশেহারা দমকা বাতাস এসে আমার আশে পাশে বুঝি কাণাকাণি করছিল, ওরে তোর ভবিষ্যতের যাত্রা পথটিকে এই বেলা বেছে নে; কিন্তু সে কোন্ পথ?

রিয়াজের কথা মতো যদি কাল গিয়ে হাকিমকে বলি যে আমি স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছি, তা'হলে ত ওর পত্নী হয়ে সারা জীবন ওর সঙ্গেই কাটানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না! আত্মীয় বান্ধব ছেড়ে—দেশ ও ধর্ম্মত্যাগী হয়ে—লোকের কুৎসা ও অভিশাপ মাথা পেতে নিয়েই জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাতে হবে। সে আমি কি করে পারবো? কিন্তু যদি গিয়ে হাকিমকে সে কথা না বলি, তা হলে রিয়াজের জেল হবে—বহুদিন হয়ত তাকে ঘানি ঠেলতে দিবে। তা ওর শরীরে সইবে, না আর তাতে আমার কি লাভ? রিয়াজ যতই অন্যায় করুক না কেন, সেই ত' আমায় ভালবেসেছে—নিজের স্ত্রীকে উপেক্ষা করেও আমার জন্য

পাগল হয়েছে! নচেৎ, সহায়-সম্পদ, বন্ধু-বান্ধব সব কিছু থাকতে তার আজ এ দশা কেন?

রিয়াজ বলেছিল যে মুসলমানও মানুষ, সেও প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে জানে—বাঞ্ছিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করতে পারে। তাতো সে করেছে। শত ক্লেশ ও বিপদ অগ্রাহ্য করে, কত অন্ধকার রাতে সে আমাদের ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমার এ পোড়া কণ্ঠস্বর শোনবার আশায়। অক তরে নিজের টাকা খরচ করে কল্‌কাতা থেকে বই আনিয়েছে, আমার পড়বার জন্য। কৈ আর ত কেউ আমার জন্য এমন কিছুই করে নি। সেই রিয়াজ আজ জেলে কয়েদি, আমার জন্যই তার এই বিপদ, আর আমিই যদি তাকে না বাঁচাই—! কিন্তু তা হলে যে মিথ্যা অপবাদ স্বেচ্ছায় মাথা পেতে লওয়া হয়—আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে চির বিচ্ছেদ ঘটে?

সেই রাতটি যে আমার কি করে কেটেছে ভগবানই জানেন। কত ভেবেছি, কত কেঁদেছি, ঈশ্বরকে কত ডেকেছি, কিন্তু কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করে উঠতে পারিনি। যতই ভাবিনা কেন, চিন্তা যেন একই আঁকা-বাঁকা-দীর্ঘ-পথ পরিভ্রমণ করে আবার সেই গোড়ার প্রশ্নেই ফিরে আসে—মীমাংসা কিছুই হয় না। এই করে দীর্ঘ জাগর রাত যখন অবসান হতে চলেছে, তখন বুঝি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই পরদিন শয্যা ত্যাগ করে উঠতে বিলম্ব হলো।

বাইরে যেতেই আমিনা বললো—তোমার ত আজ অনেক

দূর যেতে হবে, হাত মুখ ধুয়ে এসো তারপর একটু দুধ জ্বাল দিয়ে খেয়ে নাও, নইলে খালি পেটে অতদূর হেঁটে যেতে পারবে কেন! ফিরতেও ত তোমাদের রাত হবে।

তার ঐ ব্যবস্থায় আমি কোনই আপত্তি করলাম না, শুধু জানালাম যে স্নান না করে আমি কিছুই খাই না।

আমিনা বললো—তুমি তবে যাও চান সেরে জল্‌দি তৈরী হয়ে নেও গে। ছমির খেতে বসেছে তার দেরী হবে না।

আমিনার নির্দ্দেশে কাপড় গামছা নিয়ে পুকুর ঘাটে যেতে হ'ল। সেই নির্জ্জন ঘাট—দুটি চোখে আজও আমার স্পষ্ট হয়ে জাগে। আমারই দারুণ নির্ব্বাসন দুঃখের সাক্ষীরূপে আজও বুঝি তেমনি পড়ে রয়েছে। তার স্নেহের ধারায় আমার দেহের জ্বালা যেন মুহূর্ত্তের জন্য জুড়িয়ে যেতো। তার সেই শ্যাওলা-মলিন-কাজল-জলে দুটি চোখের কত তপ্ত অশ্রুই না কত দিন ঝরে পড়েছে! আমার দুঃসময়ের সেই শীতল—সখীর স্মৃতিতে আজও আমার মন যেন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে।

দীর্ঘ দশটি দিন পরে আমি কম্পিত পদে ও শঙ্কিত মনে ঐ পাপ পুরী ছেড়ে ছমিরের সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম—কোথায় চলেছি জানি নে। গৃহ-প্রাঙ্গণ ছেড়ে একটু দূরে আলো-ছায়া বিজড়িত শ্যামলতার মাঝে গিয়ে পৌছিতেই মনে হ'ল আমার দুটি পা-ই বুঝি সহসা ভারী হয়ে উঠেছে। পথের দুধারে ছোট বড় বৃক্ষশ্রেণী শাখা প্রশাখা বিস্তার করে রয়েছে। নির্ব্বাসনের কারাগার ছেড়ে এতদিন পরে যদি বা মুক্ত প্রকৃতির

মাঝে বের হয়ে পড়েছি, কিন্তু চলেছি কোথায়? যা বরণ করতে চলেছি, সে কি মুক্তি, না চির বন্ধন? হায়, কলঙ্কিনী নারীর মুক্তির কল্পনা,—সে যে বড় নিষ্ঠুর আত্ম প্রতারণা।

ছমির ও আমি উভয়েই নিঃশব্দে চলেছিলাম। অনেকক্ষণ পথ চলতে চলতে শরীর ক্রমে শ্রান্ত হয়ে এলো, যখন আর পারি না, কোথাও গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করে আবার পথ চলতে লাগলাম। পথ চলতে চলতে কতবারই না সেই নদীর সাক্ষাৎ! শত ভঙ্গিমায় কোন সুদূর অভিসারে তেমনি কালোচ্ছ্বাসে সে ছুটে চলেছে। সারা পথ শুধু চিন্তা আর চিন্তা। সেই কাল রাতের স্মৃতি তীক্ষ্ণ তীরের মত বুকে বাজে। সঙ্গাহারা নারীর প্রতি রিয়াজের সেই পাশবিকতা, হায় রে যে আমার সর্ব্বনাশের নায়ক, আমি তারই মুক্তি কামনায় ছুটে চলেছি! কেন, কি আমার দায়?

কোন দায় নেই। তবু তাকে উদ্ধার করবার জন্য নিজে আজ অনন্ত অভিশাপ মাথা পেতে নিতে চলেছি! আমার জন্য রিয়াজ কেন জেলে যাবে—তার শাস্তি হলে আমার তাতে কি লাভ? সে আমার সর্ব্বনাশ করেছে বটে, কিন্তু ভালও ত বেসেছে। ভাল না বাসলে সে আমাকে চুরী করে আনবে কেন—আমার জন্য এত বড় বিপদ মাথা পেতে নিতে যাবে কেন?

পূবের রক্তিম সূর্য্য কখন মাথার উপর উঠে এসেছে। অদূরের কোন্ এক জনতার অস্পষ্ট কলরব সহসা কানে এসে বাজলো।

সম্মুখের পানে চাইতে চোখে পড়লো নদীর বাঁকের মুখে সহরের প্রান্ত ভাগ—সারি বাঁধা ঘন পত্র-পল্লব-সমাকীর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে ইতস্ততঃ সৌধ রাজির খণ্ড অবয়বের শুভ্র শোভা। খানিকটা ভিতরের দিকে বট ও অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বহু জন-সমাগম। বোধ হয় তাদেরই সমাবেত কণ্ঠস্বর চক্রহারা লক্ষ ক্ষুব্ধ মধুপের গুঞ্জনের মত বাতাসে ভেসে আসছে।

আমার সম্মুখে আজ এ কি কঠিন সমস্যা—কি করে তার সমাধান হবে? বিচারকের সম্মুখে আমি কি বলবো? আমার কথায় তিনি কি রিয়াজকে মুক্তি দেবেন? যদি দেন তাতেই বা আমার মুক্তি কোথায়? আমার মিথ্যা উক্তি যে আমাকে তখন রিয়াজের হাতে নিঃশেষে সঁপে দেবে—কোন আপত্তিই.ত তখন আর টিক্‌বে না।

— ৯ —

অবশেষে খেয়ার নৌকা তীরে গিয়ে ভিড়লো। ছমিরের ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করে পাড়ে নামলাম। শত কৌতুহলী নিলজ্জ দৃষ্টি, তারই মাঝখানে ছমিরের সঙ্গে মন্ত্র-মুগ্ধার মত চলেছি—জানিও না কোথায় যাচ্ছি, তবু মন কেমন শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

সম্মুখের বটগাছ গুলির নীচ দিয়ে যে প্রশস্ত রাস্তা, সেই দিকে না গিয়ে ডান দিকে অপরিসর পথ ধরে ছমিরের পিছু পিছু যে টিনের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, আসবাব পত্রের মধ্যে সে ঘরে বেশ বড় একখানি তক্তাপোশ—তার উপর কালির দাগ লাগানো মলিন একখানি আস্তরণ। নীচে একপাশে তামাকের সরঞ্জাম। পোড়া তামাক ও টিকের ভস্ম সারা মেঝে একাকার হয়ে আছে। ঘরের রুদ্ধ বাতাসে ধোঁয়াটে গন্ধ—আমার নাকের সার. রন্ধ্র পথ মুহূর্ত্তে জ্বালা করে উঠলো।

ছমির আমাকে বসতে বলে নিজেও মেঝেতে বসে এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে টানতে লাগলো। খানিকক্ষণ একমনে তামাক টেনে, নাক মুখ দিয়ে ধুয়া বের করতে করতে ঐ নির্জ্জন নোংরা ঘরে আমাকে একাকী রেখে সে বেরিয়ে গেল। বলে গেল—তুমি সবুর কর, আমি উকিল বাবুকে খবর দিয়ে আসি গে।

এতই তাড়াতাড়ি সে উঠে চলে গেল যে তাকে যেতে নিষেধ করবার সুযোগও আমি পেলাম না। একাকী সেই অপরিচিত স্থানে বসে বসে ক্রমে ভয়ে উৎকণ্ঠায় আমার শ্বাস রোধ হয়ে এল। ঐ নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব ঘরে ছমিরের সঙ্গ-হারা হয়েও নিজেকে বড়ই বিপন্না বলে মনে হতে লাগলো—মুহূর্ত্তও যেন কত দীর্ঘ কাল। অদূরে শত কণ্ঠের কোলাহল, তাদের ব্যস্ত চল-চঞ্চলতা—তবু ত আমার আতঙ্কের বিরাম নেই। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত—কত শত অগণিত মুহূর্ত্ত কেটে যেতে লাগলো—তবু ছমিরের দেখা নেই। আশে পাশে কোথাও থেকে তার এতটুকু সাড়াও কাণে এসে বাজে না। বুকের স্পন্দন বাইরেও কখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো—তবু ও ছমির ফিরে এল না। তবে কি সে আর আসবে না? এই অজানা দেশে সে কি আমায় নির্ব্বাসন দিয়ে গেল? ভাবতে সমস্ত দেহ মন আমার শিউরে উঠলো—ভয়ে দুশ্চিন্তায় বুকের রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে জমে এল। হায়, আমার দুর্গতির কি কোনই শেষ নেই।

অবশেষে ছমিরের আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি তখন হঠাৎ সে ফিরে এল কিন্তু একাকী নয়—তার সঙ্গে সঙ্গে এল প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। ছমির কাছে থাকা সত্ত্বেও ঐ লোকটিকে দেখে আমার মন আশ্বস্ত হলো না। ভদ্রলোকের বিচিত্র পরিচ্ছদের মাহাত্ম্যে তার পরিচয় অনুমান করা কঠিন হয়নি—তিনি উকিল।

তার কৌতুক-প্রচ্ছন্ন কুটিল দৃষ্টি, অধর প্রান্তে তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি, ততোধিক দ্বিধাহীন মুখের ভঙ্গিমা ও কথা বার্ত্তার ধরণে, আমার মন বড়ই দমে গেল। একেই না রিয়াজ আমার সহায় নিযুক্ত করেছে, ইনিই সব ঠিক করে দেবেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন আমার নাম সুশীলা কিনা। নীরবে মাথা নেড়ে স্বীকার করাতে তিনি বললেন—বোধ হয় জানো আজ তোমার রিয়াজের বিচার হচ্ছে। তুমি যে নিজে থেকে ওর সঙ্গে পরামর্শ করে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছো, হাকিমকে তা বলতে হবে, বুঝলে! তখন যেন হাঁ করে থেকোনা।

তার ঐ জঘন্য প্রস্তাবে আমার দেহের প্রতি শিরায় উষ্ণ রক্ত-স্রোত বইতে সুরু হলো। ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে এত বড় আত্মাবমানের কথা আমার মুখে কি করে আসবে! না আমি পারবো না—প্রাণ গেলেও না।

—ওকি, চুপ করে রইলে যে ?

আমার অন্তর ভরা বিদ্রোহ তাই বুঝি রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করেও কথা বেরিয়ে এল, বললাম—আমি কোন দিন ওর সঙ্গে পরামর্শ করিনি—ওর সঙ্গে আলাপও ছিলনা কোন দিন। ওই বরং—চোখ ও ভুরু কুঞ্চিত করে অ-সহ বিরক্তি সূচক ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠলেন—এই মজালে দেখ্‌ছি। দেখ, আলাপ পরামর্শ আগেই কর, আর পরেই কর, মোদ্দা ঐ কথা তোমায় বলতেই হবে, নইলে ওর জেল নির্ঘ্যাত—তাই চাও ?

পায়ের নীচে মাটি যেন টল্‌ছিলো। নিজের উপর এত বড় অত্যাচার এত বড় হীন অভিযোগ, মিথ্যা হলেও একে অস্বীকার করবার উপায় আমার নেই—রিয়াজের কারানির্য্যাতন। তাই মাথা নেড়ে জানাতে হ'ল—না তা আমি চাইনে।

—এইতো কথা! তা হলে ঐ কথাই তোমায় বলতে হবে—তুমি আগে থেকে ষড়যন্ত্র করে স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে চলে এসেছ, বুঝলে! দেখো. শেষে যেন ঘাব্‌ড়ে গিয়ে সব মাটি করে বসোনা।

তার এ কথার কোন উত্তরই আমার মুখে এলোনা। চকিতে একটা ইঙ্গিত পূর্ণ কটাক্ষ করে উকিল বাবু আপনা থেকে আবার সুরু করলেন—জানতো রিয়াজ তোমায় কত ভালবাসে! ওদের টাকা কড়ির ত কিছু অভাব নেই—শুনেছি তোমার জন্য অনেক দামী গয়না গাটিও নাকি করতে দিয়েছে। একেই বলে কপাল—পরম সুখে থাকবে বুঝলে। আর ধর ওর যদি জেলই হয়, তাহলে ওর চেয়ে দেখছি তোমারি বেশী বিপদ, তুমি দাঁড়াবে কোথায়।

তারপর বিচারকের সম্মুখে কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে সে সম্বন্ধে অনেকক্ষণ অবধি আমাকে উপদেশ দিয়ে অবশেষে তিনি বললেন—যাক্, এখন আর সময় নেই তোমার ডাক্ পড়লো বলে। এইটুকু রাস্তা চলে আসতে যা দেরী করে ফেলেছ, এখন এস আমার সঙ্গে।

এই বলে তিনি বাইরের দিকে এগুলেন। আমি ছমিরের দিকে তাকালাম, সে'ও বল্লে - চলে এসো।

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি, প্যান্ট্ ও বড়-বড়-বুতামওয়ালা কোট-পরা, মাথায় টুপি, লম্বা এক বাবু দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে। আমরা বের হতেই উকিলবাবুর সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে তিনিও আমাদের সঙ্গ নিলেন।

আমরা অদূরস্থিত সেই বৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশ করলাম। সেইখানে পা দিতে না দিতেই উকিলবাবু দ্রুতগতি অন্যকাজে চলে গেলেন। আমাকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, কোন ভয় নেই। তারই নির্দ্দেশে ছমিরের সঙ্গে বিচার গৃহের বিস্তৃত বারান্দার অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। অদূরে কর্ম্ম-ব্যস্ত জনতার বিচিত্র গুঞ্জন। আশে পাশে ব্যগ্র চোখের অশিষ্ট কৌতুহল দৃষ্টি আমার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে কোন্ এক রহস্যের সন্ধ্যানে চঞ্চল হয়ে ফিরছিল। আমার নিদারুণ কলঙ্ক কালিমা বুঝি বা সারা মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই তা ঢাকবার সতর্ক প্রয়াস ওদের চোখে হয়ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেও ক্রমে লোকের ভিড় হওয়ার উপক্রম হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কোট্ পান্ট্ পরা সেই লম্বাবাবু নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, একজন পাহারাওয়ালাও কখন সেখানে এসে জুটেছিল, তাদের ভ্রুকুটি ও গর্জ্জনে কৌতুহলাকৃষ্ট জনতা নিমেষে হটে গেল।

ক্ষণকাল পরে ঐ দীর্ঘ বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে কর্কশ চীৎকারে আমারই নাম, আমারই আহ্বান সহসা ধ্বনিত হয়ে উঠলো। কি বিকট কণ্ঠস্বর! নিমেষে আমার সারা দেহ-মনে একটা তীব্র তড়িৎ শিখা শত কম্পনে বয়ে গেল। সম্মুখের জনতা যেন কেমন চঞ্চল ও মুখর হয়ে উঠলো।

লম্বাবাবু বল্লেন—তোমার ডাক পড়েছে শিগ্গির চল। ছমিরের দিকে তাকাতে সেও ইসারায় বল্লে, চল। উপায় নেই চলতে হ'ল। ঐ অচেনা বাবু আমার আগে আগে ও পাহারাওয়ালা পিছনে চলছিল। ছমিরকে দেখতে পেলাম না, সে হয়ত ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে, এই অবস্থায় জনাকীর্ণ দীর্ঘ বারান্দা পার হয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করতেই একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর কাণে এসে বাজলো—এই যে সুশীলা।

চোখ ফিরিয়ে দেখি, দেয়ালের একপাশে দাঁড়িয়ে আমাদের পুরোহিত ঠাকুর এবং তারই ওধারে মামা। দৃষ্টি আমার ঝাপ্সা হয়ে উঠলো, ফিরে চোখ তুলে চাইবারও শক্তি হলনা। তবু কি এক আকর্ষণে সেইদিকে হয়তো পা বাড়িয়েছিলাম মুহূর্ত্তে একটা রুক্ষ কণ্ঠস্বর কাণে এল—ওদিকে নয়, ঐ খানে।

ভয়ার্ত্ত মনেও কম্পিত পদক্ষেপে অবশেষে সম্মুখের একটা কাষ্ঠ মঞ্চে উঠে দাঁড়ালাম। অদূরে বিচারকের ভিতিব্যঞ্জক মূর্ত্তি—তার আশে পাশে আরও যারা বসেছিল সকলের মুখই অত্যন্ত গম্ভীর। আমার বুক ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে গেল—না জানি কি সর্ব্বনাশই মাথার উপর ঝুলছে! এক প্রান্তে

দৃষ্টি পড়ায় সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো · জন কয়েক পুলিসের হেপাজাতে উদাস নয়নে রিয়াজ দাঁড়িয়ে। এই কয় দিনের মধ্যেই তার দেহ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মুখশ্রী রুগ্ন মলিন হয়ে গেছে। ম্লান দৃষ্টিতে সে বুঝি আবারও আমাকে তার করুণ মিনতি জানালো।

হাকিমের সামনে কি বলবো তখনও আমি স্থির করে উঠতে পারিনি। সেই ধূর্ত্ত উকিলের শাসানো, রিয়াজের কাতর চাউনি ও তার শ্রান্ত বিষণ্ণ মূর্ত্তি যেমন তাদের আবেদন জানাচ্ছে, অপর পক্ষে তেমনই শত্রু লোকের আশা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ রয়েছে, তাছাড়া মামা ও পুরোহিত ঠাকুর আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। আমি কি বলব কি করব? কিন্তু তখন আর এতটুকুও চিন্তার অবসর ছিলনা। সেই মুহূর্ত্তে প্রশ্ন স্বরু হলো—প্রশ্নের পর প্রশ্ন— অতি কর্কশ কদর্য প্রশ্ন, তার বুঝি শেষও নেই।

অবিশ্রান্ত .প্রশ্নের হিড়িকে ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়ার উপায় ছিলনা, তাই আমার কলঙ্কের কথা একে একে সব কিছুই স্বীকার করে যেতে হ'ল। এমনি করেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে যে না বলে যেন ছাড়াছাড়ি নেই। ঐ নির্ম্মম বিচারাভিনয়ের যেটুকু আজও আমার স্মরণ আছে তা এই যে, একে একে দুইজন উকিলবাবু দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ অবধি আমাকে অবিশ্রান্ত প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল এবং তার মধ্যে অধিকাংশই নির্লজ্জ কুৎসিৎ অপমান জনক

প্রশ্ন। সেই দিনকার অভিজ্ঞতার ফলে বেশ বুঝেছি যে হিন্দু সমাজের অসহায়া বাল-বিধবা কেবলমাত্র দুর্বৃত্তেরই ভোগ-বাসনার লক্ষ্য হয় তা নয়, ভাগ্যদোষে যে অভাগিনী সতীত্ব হারায় সে-ই উকিল মোক্তার হাকিম ডাক্তার সকলেরই হাঁসি টিট্‌কারি ও সর্ব্বসাধারণের কৌতুক উপভোগের বিষয় হয়; তার মান-মার্য্যাদা সুখ-শান্তিতে সকলেরই যেন লুটের অধিকার।

—০—

— ১০ —

উঃ সেই দিনের স্মৃতি আজও আমার মনে বিভীষিকা এনে দেয়। এত দুঃখ পেয়েও আমার দুঃখের শেষ হয়নি—সেই দিন ভেবেছিলাম আমার দুঃখের বুঝি কোনই সীমা নেই। না শেষ আছে, আজ যা আমি পেয়েছি জীবনে তা পরম সৌভাগ্যের সন্দেহ নেই, তবু সেদিন যা হারিয়েছি তাকেও তো তুচ্ছ বলে মানতে পারিনে। কিন্তু থাক সে কথা।

উকিলবাবুদের অবিরাম প্রশ্ন বর্ষণে ও বিচারালয়ের সেই নির্ম্মম আবহাওয়ায়, ভয়ে ও বিস্ময়ে, আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে বাহ্যজ্ঞান ও বুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়েছিল। প্রশ্ন অবশেষে শেষ হলো—কে যেন আমায় কি বল্লে—আমি বুঝতে পারিনি। পরে সেই লোকটিরই প্রচণ্ড এক ধমকে চমকে উঠলাম। মামা ততক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ডাকলেন—আয় সুশীলা।

মামার ঐ ডাকে আজ আমার সমস্ত প্রাণ যেন নিমেষে জুড়িয়ে গেল—চোখে জল এলো। সেই মঞ্চ থেকে নেমে ভিড়ের ভিতর দিয়ে অতি কষ্টে তাঁর সঙ্গে বের হলাম। বারান্দা পার হয়ে বট গাছ গুলির নীচ দিয়ে খানিক দূর যেতেই দেখি, নদীর পারে দাঁড়িয়ে আমার মা পুরোহিৎ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন—সামনে একখানি নৌকা বাঁধা রয়েছে। মা'ও আমায় নিতে এসেছেন দেখে আমার আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব সইলো না, তার বুকে আশ্রয় নেবো বলে ছুটে গিয়ে হাত বাড়াতেই "ছুঁসনি পোড়ার মুখী" বলে শশব্যস্তে তিনি কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। স্তম্ভিত হয়ে আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম—মুখ দিয়ে বুঝি বেরিয়ে গেল—আমার মা!

মায়ের এই অপ্রত্যাশিত নির্ম্মম প্রত্যাখান বুঝি বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার অন্তস্থল অবধি নিমেশে ভস্মীভূত করে দিয়েছিল—চোখে জল বা কাঁদবার শক্তিও আর ছিল না। প্রাণের ঐ দারুণ জ্বালায় মুখও বুঝি বা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তাই দেখে মা এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু পুরোহিৎ এক ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে বল্লেন—তুই তো বোকা নোস্ সুশীলা, বুঝতে তো পারিস যে এই কেলেঙ্কারির পর এখন কি আর তোর মার সঙ্গে ছোঁয়াছুয়ী করা সাজে! এখনই তো তোর মামাকে গ্রামে "চল" রাখা মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে যদি তুই একটু সমজে না চলিস তাহলে তো এদের সব একঘরে হয়ে থাকতে হবে।

তাঁর কথার আমি কোনই উত্তর দিলাম না দেখে তিনি আবার বলতে লাগলেন—নেড়ে বেটার ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছিলো ওর বাপ ওমরা বেটা ছোটলোক, নিজে হাতে চাষ বাস করে খেতো। দেখতে দেখতে বেটা পাটের ব্যবসায়ে ফেপে উঠলো। তারপর ছোট ছেলেটাকে ভদ্রলোক সাজিয়ে দিলে কিনা ইংরাজি পড়তে। তার বাপু এ সব সইবে কেন, মাথা বিগড়ে গেল—করতে গেল ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ। ভেবেছিল ঈশ্বর বুঝি নেই, বিচার আচার নেই—টাকার জোরেই দিনকে রাত করা যায়। বাবা, সত্যনারায়ণের পূজো মেনে রেখেছি কি অমনি! এখন বেটা জেলে পচে মর আর বোঝ ভগবান আছেন কি না!

পুরোহিতের কথায় আমি শিউরে উঠলাম! রিয়াজকে তবে ওরা পচিয়ে মারবে জেলে! সে আমায় ভালবেসেছিল—আমার জন্য পাগল হয়েছিল, আমি তার এই প্রতিদান দিয়ে এলাম!—শেষ অবধি যে আমার কৃপা ভিক্ষা চেয়েছিল, আমি তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করে এলাম!

এই চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুললো। আমি আর থাকতে না পেরে মামাকে বললাম যে আমার কপালে যা ছিল তাতো হয়েছে। রিয়াজকে জেলে পচিয়ে মেরে তো আমাদের কোনই লাভ হবে না। আমরা হাকিমকে গিয়ে বললে তিনি কি আর ওকে ছেড়ে দেবেন না!

আমার কথা শেষ হতে না হতে মামা ও পুরোহিত এক-

সঙ্গে চেঁচামেচি করে কি বলে উঠলেন আমি বুঝতে পারলাম না। মা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন—তখনই তো বলেছিলাম, মেয়ে মান্ষের বেশী বিদ্যে ভাল নয়, ইংরিজি পড়া ভাল নয়। তা আমার কথা তখন কে শোনে। বিধবা হয়ে অত লেখা পড়া শিখলে কি আর স্বভাব চরিত্তির ভালো থাকতে পারে! আমার কপালে শেষে এই ছিল,—তার চেয়ে তোর মরণ হলো না কেন পোড়ার মুখী। এমন কুলে কালি দিলি—এ কলঙ্কের চেয়ে তোর মরণও যে আমার ছিল ভাল। সে শোক বরং সওয়া যায়—এ কলঙ্ক যে রাখবার ঠাঁই নেই।

গত বারো দিনের নিদারুণ ক্লেশ ও সন্তাপে আমার দেহ মন জর্জ্জরিত হয়েছিল। আজকের ঘটনাবলী ও আমার পক্ষে কম ক্লেশকর হয় নি। তার উপর মার ঐ নিষ্ঠুর কথাগুলি শেলের মতো বুকে এসে বাজলো। মা কি তবে আমাকেও দোষের ভাগী সাব্যস্ত করেছেন? আমার এ কলঙ্ক, এত লাঞ্ছনা, সব স্বেচ্ছাকৃত পাপের ফল বলে বিশ্বাস করেছেন? বড় ব্যথা পেয়ে মা'র জন্য যে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল—সকল চিন্তার আড়ালে মায়ের চিন্তাই যে নিশি-দিন আমার মনে জাগতো। তার সর্ব্ব-শ্রান্তি-হরা শান্তি-ক্রোড়ে—সর্ব্ব-হারা আমি, এতটুকু সান্ত্বনার আশ্রয়ও ত পেলাম না। যার স্নেহ আমার রিক্ত-জীবনের একমাত্র সম্বল, সেই মাও আমায় ভুল বুঝলেন—তার চোখেও আমি কলঙ্কিনী? সেই মুহূর্ত্তে বুঝি বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম!

— ১১ —

কার দুখানি হাতের স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে চেতনা ফিরে এল। মুখ তুলতেই চোখে পড়লো, আমার পাশে বসে একজন স্থূলকায়া প্রৌঢ়া মেমসাহেব। কিছুকাল আগে বিচার কক্ষে তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম। আমার বিশৃঙ্খল কেশগুচ্ছ সযত্নে বিন্যস্ত করে দিয়ে তিনি বললেন—কেঁদে আর কি হবে মা! যিনি বিপন্নের আশ্রয়, পাপী তাপির ভরশা, তাঁর উপর নির্ভর কর। মানুষ বিচার করে, সাজা দেয়—তিনি ভালবাসেন, সব কিছুই বোঝেন, তাই ক্ষমা করেন; তোমার ভয় কিসের!

উপর্য্যুপরি এতগুলি নিষ্ঠুর আঘাতের পর এক অপরিচিতা বিদেশীনির এই করুণ ব্যবহার ও মধুর সান্ত্বনা বাক্যে আমার কি জানি বড়ই কান্না পেল—সে বেগ সম্বরণ করতে পারলাম না। তিনি সস্নেহে আমার অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে সকলের মুখের অব্যক্ত প্রশ্নটি অনুমান করেই যেন বললেন—আমার দুর্ঘটনার সংবাদ কাগজে পড়ে তিনি চাঁদপুরের মুক্তি-ফৌজের আশ্রম থেকে এসেছেন আমার খোঁজ নিতে, কারণ তাঁরা জানেন যে, হিন্দু সমাজের দুর্ভাগী মেয়েরা লম্পটের কবল থেকে মুক্তি পেলেও নিজ নিজ পরিবারে আর আশ্রয় পায় না। আমারও যদি তেমন সমস্যা দাঁড়ায়, তবে তিনি আমাকে তাঁদের আশ্রমে নিয়ে যেতে পারেন।

তাঁর ঐ কথা শুনে আমি শঙ্কিত জিজ্ঞাসু-নেত্রে মামা ও অন্যান্য সকলের পানে চাইলাম। পুরোহিত বলে উঠলেন—আহা, কি দরদ রে আমার! সেখানে নিয়ে খৃষ্টান করবে এই তো তোমাদের মতলব! সে হচ্ছে না মেমসাহেব—সরে পড়। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—জাত খোয়াতে ওর সঙ্গে যাবি কোন দুঃখে! রামদাসী বৈষ্ণবীকে বলে রেখেছি, এখন গিয়ে এই কিছু দিন তার আখড়ায় থাক, তারপর পরামর্শ করে কাশী নবদ্বীপ যেখানেই হোক্—একটা ঠিক করা যাবে।

রামদাসী বৈষ্ণবীর নাম শুনতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। সেই দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকটীর. বহু দুষ্কর্ম্মের ইতিহাস জানে না এমন লোক আসে পাশের আট দশখানি গ্রামের মধ্যে বুঝি একজনও নেই। অবশেষে তার আশ্রয়ে? কেন, বাড়ীতেই যদি আশ্রয় না পেলাম, মা মামা এরাই যদি আমায় ত্যাগ করলেন, তবে কোন সুখে আর বেঁচে থাকবো? মামাকে জানালাম—প্রাণ থাকতে আমি সেখানে যেতে পারবো না। আমার যদি আর কোথাও আশ্রয় না জোটে, নদীতে জলের অভাব নেই, সেখানে জুটবে। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললাম।

মিশনারী মহিলাটি আমার ডান হাতখানি সযত্নে টেনে নিয়ে বল্লেন—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। আত্মহত্যা মহাপাপ। তোমার আত্মীয়গণ যদি কোন ভাল ব্যবস্থা করতে না পারেন, তুমি আমার সঙ্গে চল। তোমার ভয় নেই—আমরা জোর

করে কাউকে খৃষ্টান করি না। আমাদের আশ্রমে যত মেয়ে আছে সবাই খৃষ্টান নয়। একটি মেয়ে আছে সেতো গোঁড়া হিন্দু আলাদা করে নিজ হাতে রান্না করে খায়। ইচ্ছে হলে তুমিও তা করতে পারবে।

এ প্রস্তাবে কেহই রাজী হলেন না। অবশেষে মামা গিয়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ডেকে নিয়ে এলেন পরামর্শ করবার জন্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রাচীন লোক, মামার বন্ধু এবং স্থানীয় একজন প্রবীণ উকিলের মুহুরী। আরও একজন ভদ্রলোকও এঁদের সঙ্গে এলেন, শুনলাম তিনি পুলিশের বাবু।

বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হলো যে আমাকে দেশে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। কাজেই এখানকার বিনোদিনী ধাত্রীর গৃহে আপাতত আমাকে রাখা যেতে পারে। শুনলাম, তিনি নিষ্ঠাবতী নারী, বর্ষীয়সী। কার্ত্তিকপুরেই ধাত্রীর কাজ করেন, আর তাঁর বিধবা মেয়েও বারো টাকা বেতনে বালিকা বিদ্যালয়ের নীম্ন শিক্ষয়িত্রী। বহুদূরে কোথায় তাদের দেশ কেউ বড় একটা জানেনা। তবে না'কি শুনা গিয়েছে যে বিনোদিনীর স্বামী বর্ত্তমানেই স্বদেশে কি অপরাধে তাঁরা 'একঘরে' হয়েছিলেন; তাই সে স্বামীর মৃত্যুর পর উনিশ-বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যাসহ নির্ব্বান্ধব এই কার্ত্তিকপুরে এসে এখানেই রয়ে গেছে।

অগত্যা আমরা বিনোদিনী দাইয়ের গৃহ অভিমুখেই যাত্রা করলাম—মেমসাহেবও সঙ্গে চললেন। কাছারি থেকে নদী

পাড়ের রাস্তা ধরে পশ্চিমে অনেকটা দূরে উকিল মোক্তার বাবুদের বাসার সারি প্রায় ছাড়িয়ে, দক্ষিণের একটি অপরিসর পথ ধরে খানিকটা অগ্রসর হলেই বিনোদিনী দাইয়ের কাঁটাল-গাছওয়ালা ছোট বাসা খানি। ঐ নগরের অন্যান্য বাসার ন্যায় ঐ বাসাও দরমার প্রাচীরে ঘেরা। রাস্তার দিকে ছোট একখানি বসবার ঘর ভিতরে বারান্দাওয়ালা মাঝারি গোছের শয়ন ঘর ও ছোট একখানি রন্ধন শালা।

বিনোদিনীর দরজা প্রান্তে পৌঁছে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাকে ডাকলেন। অবিলম্বে দরজা খুলে সে বাইরে এলো এবং তার দ্বারদেশে এতগুলি লোক, বিশেষতঃ একজন মেমসাহেবকে দেখে বড়ই বিস্মিত হলো। তাকে দেখে আমারও বিস্ময়ের অবধি রৈল না, কারণ দাই শুনে আমি যা মনে করেছিলাম ইনি তা ন'ন—মনে হয় যেন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বললেন—তোমার কাছেই এসেছি বিনোদিনী, আমাদের একটা বিশেষ উপকার করতে হবে।

আপনারা বসুন এসে তারপর শুনছি, বলেই সে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে বসবার ঘরের বাইরের দিকের দরজা খুলে দিল, আমরা প্রবেশ করলাম।

সেই পরিচ্ছন্ন ছোট ঘরে একখানি নগ্ন তক্তপোষ পাতা ছিল। ভিতর দিকের দরজা দিয়ে কে একখানি মাদুর এগিয়ে দিল, সেইটি তক্তপোষের উপর বিছিয়ে বিনোদিনী সকলকে বসতে অনুরোধ করলো।

সকলেই বসতে ইতস্ততঃ করছে দেখে বিনোদিনী মেমসাহেবকে বলায় তিনি বসলেন, কিন্তু তার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও যখন আর কেউ বসলো না তখন সে ভিতর থেকে আর একখানি মাদুর এনে মেজেতে পেতে দিল। অগত্যা আমরা সকলেই বসলাম, মাও আমি মাটিতে এবং আর সবাই মাদুরে বসলেন। বিনোদিনী নিজেও মার কাছে মাটিতেই বসলেন, কিন্তু আমি অনেকটা দূরে ভিতর দিকের দরজার কাছে গিয়ে বসলাম। কারণ যার কোলে মাথা রেখে কাঁদবার জন্য আমার তাপিত প্রাণ হাহাকার করছিল, সেই মায়ের কাছ ঘেসে বসতেও সাহস হলো না, পাছে তিনি আবারও তেম্‌নি করে সরে যান।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কথাটা পাড়লেন, কিন্তু বিনোদিনী রাজী হলো না। বললো—মাফ্‌ করবেন চক্রবর্ত্তী মশাই। আমি একটা গরীব মেয়ে মানুষ, আপনাদের সবারই তাবেদার; আমি ছোটলোক হয়ে কোন সাহসে একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে বাড়ীতে রাখি বলুন?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন আমার দুর্ভাগ্যের কথা—কলঙ্কের কথা—সকলই খুলে বললেন। আমাকে নিয়ে আমার মা ও মামা যে বিপন্ন, আমার যে থাকবার আর স্থান নেই, এবং বিনোদিনী যদি এ বিপদে আমায় আশ্রয় না দেয় তবে কোন পাপ স্রোতে ভেসে কোন নরকে গিয়ে ঠেকবো তার স্থিরতা নেই, এমনই অনেক কথা বললেন। তার ঐ সকল কথায় মা'র

ও আমার চোখ দিয়ে অবিরল ধারে অশ্রু ঝর্‌ছিলো। এই সকল কাহিনী শুনতে শুনতে বিনোদিনী বারে বারেই আমার দিকে তাকাচ্ছিলো। ক্রমে তার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হলো, যা শুনে অন্য লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, তা শুনে এই রমণীর মুখখানী সহানুভূতিতে উদ্ভাষিত হয়ে উঠলো।

বিনোদিনীর বিধবা কণ্যা বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা বার্ত্তা সবই শুনছিলো। ঐ সকল কথা শুনতে শুনতে সেও করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইছিলো। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা শেষ হলে 'আমি আসচি' বলে বিনোদিনী উঠানে কণ্যার নিকট গেল। মা ও মেয়েতে দুই মিনিট কি পরামর্শ হল, তারপর ঘরে ফিরে এসে বিনোদিনী বললো—আচ্ছা তবে তাই হোক্। ওরা যখন মুস্কিলে পড়েছেন তখন ইনি আপাতত এখানেই কষ্টকরে থাকুন, পরে আপনারা কোন ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন।

পুরোহিত বললেন—তা বৈ কি! দু'চার মাস যাক্ না, পরে একে আমরা কাশীতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করবো।

কথাবার্ত্তা সব শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে এল। পুরোহিত তখন মামাকে বললেন—অভয়, এবার চল আমরা উঠি, বাড়ী পৌছিতে যে রাত হয়ে যাবে অনেক।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বললেন—হাঁ বেলতলী ত এখান থেকে কাছে নয়, আপনারা আর দেরী করবেন না। তারপর মা'র দিকে ফিরে বললেন—বন্দোবস্ত ত সবই হয়ে গেল, আপনি

কিছু ভাববেন না। বিনোদিনীর বাড়ীতে এর কোনই কষ্ট হবে না। আমি ত আগেই বলেছি যে এদের আচার ব্যবহার সবই ভদ্রলোকের মতো। একবার যখন মেয়ের পা পিছ্‌লেছে তখন গ্রামে নিয়ে গেলে চোখের সামনে কি সব কেলেঙ্কারী ঘটতো কে জানে। তার চেয়ে এই ভাল হলো। বিনোদিনীকে ত জানি, যেমন নরম তেমনি গরম। তা'ছাড়া এদের এখানে কোন পুরুষ মানুষের আনাগোনা নেই—বড়ই নিরিবিলি।

ততক্ষণে সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। মা'র গণ্ডদেশ বয়ে অবিরল ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো, চোখের জলে আমারও আচল ভিজে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের উঠতে দেখে এতক্ষণে নিজের প্রকৃত অবস্থা আমার উপলব্ধি হলো। মা, আত্মিয় পরিজন ও দেশের সঙ্গে চিরদিনের মতো আমি বিচ্ছিন্ন হতে চলেছি—আমি জন্মের মতো নির্ব্বাসিতা, আর হয়তো কখনই দেখা হবে না—মা বলে আর ডাকতে পাবো না! এই চিন্তায় আমার সকল অভিমানই ভেসে গেল। উন্মাদের মতো উঠে গিয়ে মামার পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বললাম—এমনি করে আমায় ফেলে যেওনা মামা, আমায় যা প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবে তাই করবো—দাসী হয়ে চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবো তবু আমায় নিয়ে চল—মাকে কল্যাণীকে, তোমাদের সবাইকে ছেড়ে আমি যে বাচবো না মামা!

আমার কথায় মা অঞ্চলে মুখ ঢাকলেন—চাপা-কান্নায় তার দেহ কাঁপতে লাগলো। পুরোহিত রূক্ষস্বরে বলে উঠলেন—

তুই ক্ষেপেছিস সুশীলা? তোর জন্য কি তোর মা মামা আত্মীয় স্বজন সবাই একঘরে হয়ে থাকবে—তোর পাপে সবাইকে ডোবাতে চাস?

মা তখন উতলা হয়ে কাঁদছিলেন, পুরোহিতের ইঙ্গিতে মামা তাঁকে ধরে নিয়ে রাস্তায় বের হলেন। তখন একে একে সবাই রাস্তায় নেমে চলতে আরম্ভ করলো। তাহাদিগকে যেতে দেখে মার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে অসহ্য বেদনায় আমি আর্ত্তনাদ করে উঠলাম। মা পিছন ফিরে দেখতে দেখতে চলেছিলেন, আমার ঐ অবস্থা দেখে মুহূর্ত্তেক থমকে দাঁড়িয়ে তিনিও একখানি হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ রাস্তায় নেমে পড়লাম, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পুরোহিত মা'র হাত ধরে টানতে টানতে নিমেষে সকলের আগে বহুদূরে তাকে নিয়ে গেল। আমি রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু বিনোদিনী ততক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরে ফেললো।

মা, ওরা সোজা উত্তর দিকে চলেছিলেন। যতক্ষণ তাদিগকে দেখা গেল আমি চোখের জলের ভিতর দিয়ে নির্ব্বাক-নিস্পন্দ দৃষ্টিতে তাদের দিকেই চেয়ে রইলাম। সোজা চলতে চলতে তাঁরা নদী পারের রাস্তায় পড়ে যখন মোড় ফিরলেন তখন আর তাদের দেখা গেল না। তবু মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় সেই দিকেই চেয়ে রইলাম। চোখ দু'টি সম্মুখে আর কিছুই দেখতে পেলোনা বটে, কিন্তু দূরে দৃষ্টির অন্তরালে মন আমার ঝাপসা চোখ

দু'টি ভেদ করে দেখতে পেলো,—আমার স্নেহ-মায়া শত স্মৃতি-বিজড়িত আশৈশবের লীলা-নিকেতন খানি। দেখতে পেল, আমার বড় সাধের সেই পাঠশালা—সেই তুলসীমঞ্চ—সেই সব পরিচিত পথ ঘাট—দীঘির পারে সেই রাধামাধবের মন্দির—সন্ধ্যায় সেখানে মঙ্গল আরতি। আরও দেখতে পেল, বড় ঘরে কল্যাণী তখন সাঝের প্রদীপ জ্বেলে লক্ষ্মীর আসন পাতছিল, তারপর বাতাসা দুখানি, পান, ছোট গ্লাসটিতে জল, সিন্দুর কৌটা, আরসি ও চীরুণী সব সাজিয়ে রেখে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠলো। আমি আর কোন দিনই সেখানে যেতে পাবো না। সেই লক্ষ্মীর আসনতলে প্রণামের সৌভাগ্য—অলক্ষ্মী আমি—চিরদিনের মতোই আমার ঘুচে গেছে।

— ১২ —

এই নূতন আবাসে আমার চারটি দিন কেটে গেছে। দিনে একটিবার মাত্র কুমোদিনীর সঙ্গে অদূরস্থিত পুকুরঘাটে চান করতে যাওয়া ভিন্ন কখনও আমি দাইমার অপরিসর বাসার বাইরে যাই নি। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই আহারাদি সেরে কুমোদিনী স্কুলে চলে যায়, তারপর আমার রান্না করে খাওয়া দাওয়া সারতে দুপুর হেলে যায়, কেন না একবার ত খাওয়া, তাড়াতাড়ি সেরে লাভ নেই। বিকালে কুমোদিনীর বইএর তাক্ থেকে কোন

একখানি বই বা মাসিকপত্র নিয়ে পড়ি। পুঞ্জিভূত দুঃখের চাপে প্রাণ যখন বড়ই হাঁপিয়ে উঠে, তখন মেম সাহেবের সেই কথা ক'টি স্মরণ করে মনে একটু বল পেতে চেষ্টা করি। তিনি বলেছিলেন যে সৎ সঙ্গে সৎ কাজে লিপ্ত থাকলে পাপী তাপীও প্রলোভন জয় করে পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে। প্রলোভনই যদি জয় করা যায়, তবে শোক তাপ জয় করা যাবেনা কেন? তাহলে সৎ চিন্তা ও সৎ কাজ নিয়েই থাকবো, মনকে আর বৃথা কল্পনা ও পরিতাপের অবসর দেবো না।

যেদিন আমি দাইমার বাড়ীতে এলাম তার পরদিনই সকালে সেই মেম সাহেব ফের আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বললেন যে সেইদিনই তিনি চাঁদপুরে ফিরে যাচ্ছেন, কিন্তু যাওয়ার আগে আমাকে বলতে চান যে এখন আমার নিজের ভাল মন্দ বুঝবার বয়স হয়েছে। কোথায় যাওয়া, কোথায় থাকা আমার পক্ষে অধিকতর নিরাপদ বা বাঞ্ছনীয় তা নিজেরই বিচার করে দেখা উচিত। তিনি আরও বললেন যে, যে সব আত্মীয়, বান্ধব আমাকে আশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক, বিশেষত যাদের চোখে আমি পতিতা—তাদের আদেশ বা উপদেশের উপর নির্ভর করা আমার পক্ষে কি সম্মান জনক? তারপর একটু আড়ালে আমাকে বললেন—বিনোদিনী ও তার মেয়েকে বেশ ভাললোক বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু 'মুক্তি ফৌজের' আশ্রমে গেলে কারু গলগ্রহ না হয়ে নিজে খেটে খাওয়ার—লেখা পড়া শিখে আত্মোন্নতি করবার সুযোগ পেতে, যা এখানে পেতেই পার

না। তা ছারা তোমার যে বয়স ও চেহারা, তাতে এখানে থাকা খুব নিরাপদ হবে কিনা জানি না। তবু যদি এখানেই তোমার থাকতে ইচ্ছে হয়, থাক। ভবিষ্যতে যদি আমাদের ওখানে যেতে ইচ্ছে কর তাহলে আমার নাম ঠিকানা লেখা এই খামে চিঠি দিলেই আমি এসে তোমায় নিয়ে যাবো। আমাকে ভয় বা অবিশ্বাস করো না। আমাদের আশ্রমে গেলে দেখতে পাবে তোমার মতো অভাগিনী সেখানে আরও আছে এবং আগেই বা তারা কি ছিল, আর কাজ কর্ম্ম ও লেখা পড়া শিখে, এখনই বা তারা কি হয়েছে! তাদের দেখলে তোমার প্রাণটাও আশায় আনন্দে নেচে উঠবে। তোমার আপনার জন 'পতিতা' বলে অনায়াসে তোমায় নির্ব্বাসন দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু পাপী তাপী কি সত্যি পতিতা? দুঃখী দুর্ব্বল বলে তারাই যে পরমপিতার বেশী আদরের। সৎ সঙ্গে সৎ কাজে লিপ্ত থাকলে পাপীতাপীও প্রলোভন জয় করে পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারে,তা আমরা ঢের দেখেছি। তাই পাপীকে ভাল হওয়ার সুযোগ দিতে আমরা চেষ্টা করি—পতিতা ভেবে দূরে ঠেলে দিই না। তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে বেশ বুদ্ধিমতী, লেখাপড়াও কিছু জান—আমাদের ওখানে থাকলে তোমার খুবই উন্নতি হতে পারতো। কি জানি তোমার জন্য কেমন একটা মায়া লাগ্‌ছে। যাক্, আমি তবে এখন যাই, ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

তিনি উঠে পড়লেন। বড় অসময়ে তাঁর সহানুভূতি পেয়েছিলাম। স্বজন বর্জ্জিতা কলঙ্কিনীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য

কোন দূর দেশ থেকে তিনি ছুটে এসেছিলেন। তাই বিদেশিনী বিধর্ম্মিনী হলেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত অন্তর ভরে গেল—তাঁকে ছাড়তে চোখে জল এল।

তাঁর বিদায়ে আমার এই কাতরতা দেখে আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন—কেঁদনা সুশীলা, তোমার উপর ঈশ্বরের দয়া আছে, তার আশীর্ব্বাদে তোমার মঙ্গল হবে।

আমার নিকট বিদায় নিয়ে দাইমাকে সঙ্গে ডেকে তিনি রাস্তায় বের হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে দাইমা ফিরে এসে মেম সাহেবের প্রশংসা করে জানালেন যে আমার জন্য তিনি দাইমার কাছে পাঁচটি টাকা রেখে গেছেন। তাঁর এই অযাচিত স্নেহ ও করুণার দান পেয়ে আমার চোখে আবার জল এল। কি চমৎকার লোক তিনি—অখাদ্য কুখাদ্য ভোজী খৃষ্টান, তার এত দয়া!

আমার বর্ত্তমান অবস্থায় কুমোদিনীদের সংসর্গে আপত্তি করা দূরে থাকুক; এই ক'দিনে এদের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয়, যে কোন অবস্থায় এদের সঙ্গ আমার পক্ষে পরম সম্পদ হতো—এখনকার তো কথাই নেই।

পবিত্র আশ্রমের মতো সেই ছোট্ট গৃহ-খানি-পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। দাইমার স্নেহ-যত্ন, কুমোদিনীর সান্ত্বনা-প্রীতি—আমার অভিশপ্ত জীবনে যেন নব আশীর্ব্বাদ। তাঁদের সে পূণ্য-স্মৃতি আমার মনের আকাশে উজ্জ্বল সন্ধ্যা-তারার ন্যায় আজও ফুটে রয়েছে—এ জীবনে বুঝি কোন দিনই ম্লান হবে না।

সেদিন সন্ধ্যা তখনও ঘণিয়ে আসেনি। কুমোদিনী ও আমি উঠানে পায়চারি করছিলাম। দক্ষিণের বাতাস চিন্তা-ক্লিষ্ট দেহ মণের উপর স্নিগ্ধ মায়া বুলিয়ে দিচ্ছিল। আকাশের গায়ে তখনও তারা ফুটে উঠেনি। চারদিক বেশ শান্ত স্তব্ধ। থেকে থেকে শুধু নীড়ে ফেরা পাখীর অবশ ডানার শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিলো।

দাইমার ডাক শুনতে পেলাম কাছে যেতে তিনি বললেন—কালীবাবু সেদিন যিনি তোমার উকিল ছিলেন, কি একটা দরকারে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বাইরের ঘরে তিনি বসে আছেন এসো।

ভয়ে ভয়ে দাইমার পিছু পিছু বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। উকিলবাবু তীব্র দৃষ্টিতে একবার আমার পানে চেয়ে দাইমাকে বললেন—দেখ, ওর সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে, একটু নিরিবিলি বলতে চাই।

তারপর আমাকে লক্ষ্য করে একটু হেসে বললেন—তোমার কোন ভয় নেই আমি বুড়ো মানুষ।

দাইমা বেরিয়ে যেতে যথা সম্ভব মৃদু কণ্ঠে তিনি সুরু করলেন—দেখ্‌লে, আমার কথা ফললো কিনা! সেদিন অত করে তোমায় বললাম, আর তুমি তোমার মামাকে দেখেই সব ভুলে গেলে! এখন হলো তো—মা-মামা কেউ তোমায় আদর করে ঘরে নিয়ে গেল! এ কি কেউ নেয়! তুমি ছেলে মানুষ দেখে কিনা কেমন মায়া হয়েছিল তাই তোমার ভাল করতে

চেয়েছিলাম, তা তুমি আমায় বিশ্বাস করলে না। তারপর এই যে এখানে রয়েছো—এদের তো অবস্থা জানি, কদিনই বা তোমার খরচ চালাতে পারবে। তোমার মামা মুখে যতই বড়াই করুক মাসে মাসে পাঁচটা করে টাকা যোগাবে কোত্থেকে! কাজেই দু'দিন পরে কি বিপদেই তুমি পড়বে বুঝতে পারছো না? ছেলে মানুষ—এখনও নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পার না, তাই ভেবেই না এলাম, যদি তোমার একটা কিছু সুবিধে করে দিতে পারি।

একটিপ্ নস্যি নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—রিয়াজের তো খালাস পেতে এখনও ঢের দেরী, তাছাড়া তোমার সাক্ষিতে তার সাজা হয়েছে, সেকি আর তোমায় ফিরে নিতে চাইবে! যাক্ গে, সেই নেড়ে বেটা ছাড়া কি আর লোক নেই? আমি একজনের সন্ধান পেয়েছি—কোথায় লাগে রিয়াজ তার কাছে। দেখতে যেমন রাজ পুত্তুর, টাকাও তেমনি অগাধ তোমাকে যদি তার মনে ধরে, তবে আর কথাটি নেই—একেবারে রাজরাণী। ওকি চটছো কেন—আমার কথাটাই আগে শোন।

দারুণ অপমান সূচক তার ঐ ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম ক্ষণপরে একটু আত্ম সম্বরণ করে নিলাম বটে কিন্তু মর্ম্মান্তিক ঘৃণা ও অপমানে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। অঞ্চলে মুখ ঢেকে উচ্ছসিত কান্না রোধ করে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম।হায় নিষ্ঠুর নিয়তি।

কুমোদিনী তাড়াতাড়ি আমার পাশে এসে বসে আমাকে হাওয়া করতে লাগলো। দাইমা ও উঠানে ছিলেন, ঐ ব্যক্তি চলে যেতে বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে এলেন, তারপর আমার শয্যা-পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন ; কিন্তু কেউ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

— ১৩ —

দিন কয়েক পরের কথা। আমার তাপ দগ্ধ-জীবনের উপর দিয়ে সম্প্রতি যে প্রলয়ের ঝড় বয়ে গেছে—মা ও মেয়ের অকৃত্রীম-স্নেহ-যত্ন সমবেদনায় তার গ্লানি এরই মধ্যে কতই না লাঘব করে দিয়েছে। কুমোদিনীর সঙ্গ, তার প্রীতি ভালবাসা, আমার দুর্ব্বহ জীবনটাকেও কখন হাল্কা করে তুলেছে। ওদের অপরিসর গৃহ-সীমার মাঝখানে আমার কুণ্ঠিত ক্লান্ত দৃষ্টি যেন এক নব দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সেদিন খানিকটা বেলা হয়েছে তখন, ভোরে উঠে দাই মা, কোথায় চলে গেছেন। কুমোদিনী ও স্কুলে গেছে। বাড়ীতে আমি একা—রান্নার জোগাড় করছিলাম। হটাৎ বাইরে পুরুষ কণ্ঠের সাড়া শুনে সচকিত হয়ে উঠলাম।

ভীত চিত্তে ফটকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি

পরিচিত কণ্ঠস্বর কাণে এসে বাজলো—কইরে সুশীলা, তোরা সব ঘুমিয়ে আছিস না'কি ?

আমাদের সেই পুরোহিৎ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনে আমি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম। ত্বরিত পদে বাইরের ঘরে গিয়ে দ্বার খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালাম।

ভিতরে প্রবেশ করে পুরোহিৎ ক্লান্ত স্বরে বললেন—তবু ভাল যে এতক্ষণে খুলে দিলি। চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙ্গে যাবার জোগাড় আর কি! তারপর শোন, কই হারাণ, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন—ভিতরে এস।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। দ্বার-প্রান্তে অপরিচিত একজনকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিয়ে একপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুরোহিৎ বলে উঠলেন- ওকে আবার লজ্জা কেন রে, ওতো আমাদের গ্রামের ছেলে। গ্রামের ছেলেটি তখন পুরোহিতের পাশে গিয়ে বসে পড়েছেন।

আমি নত মুখে চুপ করে রইলাম। তাকে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

পুরোহিৎ বলতে লাগলেন—তুই হারাণকে কখনো দেখিসনি বুঝি? তা কি করেই বা দেখবি, দেশে তো বড় একটা আসা যাওয়া নেই, দরকার ও তেমন পড়ে না—শুধু টাকা খরচ বইতো নয়, তা শোন্, ওপাড়ায় বোসেদের বাড়ীর পুবে ছিদাম ঘটকের বাড়ীটা চিনিস তো? হারাণ হল ছিদাম কাকারই ছোট ছেলে—ডিব্রুগড়ে সরকারী চাকরী করে।

পঁচাশী টাকা মাইনে পায়, তাবলে এতটুকু দেমাক নেই। এতদিন ওখানে বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু মাস দেড়েক হল দুটি ছেলে রেখে বৌটি মারা গেছে। দূর দেশ, বেচারার মুস্কিলের আর সীমা নেই। একে তো বংশজের ছেলে—বিয়েতে টাকা লাগে, তারপর অত টাকা খরচ করে দশ এগারো বছরের একটা কচি বৌ এনেও কোন লাভ হবে না। না পারবে সে ছেলে পুলে মানুষ :করতে, না পারবে ঘর সংসার আগ্‌লাতে। তোর এই বিপদের কথা শুনে তো হারাণ ভারি দুঃখ করছিল। ও বলে হাজার হলেও তো সুশীলা আমাদেরি গ্রামের মেয়ে—তার যখন এমন সর্ব্বনাশ, তখন যে যাই বলুক, আমরা না দেখলে আর দেখবে কে? তা সে যদি আমার ছেলে দুটি ও ঘর সংসারের ভার নেয় তবে আর খরচ পত্র করে একটা কচি খুকী বে করে আনিনে। শুনে আমার ভালই লাগলো, ভায়াকে বললাম চল তবে সুশীলার সঙ্গে দেখা করে কথা বার্ত্তা ঠিক করে আসিগে। তাইতো এত কষ্ট করে তোর জন্য এতদূর এলাম। তারপর একটু নীম্নস্বরে বললেন—পরম সুখে থাকবি, ভায়ার আমার খরচে হাত, কখনো মুখ ফুটে কিছু চাইতে হবে না-বুঝলি?

ক্ষোভে দুঃখে সারা দেহে সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিলাম। সেই পুরোহিৎ মামা—তার মুখে একি কদর্য্য ইঙ্গিত!

একটু থেমে তিনি আবার সুরু করলেন—ছোট সংসার, কাজ কর্ম্ম তেমন কিছু নেই। ঠিকে রাধুণী, ঝি আছে সমস্ত

কাজ তারাই করে। তুই থাকবি রাণীর হালে। হারাণকে তো জানি-মাটির মানুষ—কোন দিন জোরে কথাটি কইবে না। তাছাড়া. হাজার হলেও বামুনের ছেলে, সেই নেড়ে বেটার চেয়ে লক্ষগুণে ভালো-কি বলিস ? বিশেষতঃ তুই একজন ভালো লোকের কাছে আছিস্ জানলে তোর মা মামাও নিশ্চিন্ত হবে। কেন না, জাত যখন তোর গেছেই, তখন আর এভাবে কদিন থাকতে পারবি! পাঁচটি করে টাকাই বা মাসে মাসে আসবে কোত্থেকে? সব দিক ভেবেই নিয়ে এলাম ভায়াকে তোর কাছে। জানিস তো কৈলেশ শর্ম্মা না ভেবেচিন্তে কোন কিছুতে হাত দেয় না। তারপর সেই বিদেশে এখানকার কেলেঙ্কারীর কথাই বা কে জানতে আসবে; চাই কি বিবাহিতা স্ত্রী বলেও চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে—কি বল হারাণ? দুটি ছেলে যখন রয়েছে, বংশ রক্ষা ও শ্রাদ্ধ পিণ্ডির ভাবনা দাঁড়াবে না। তারপর তোর ছেলে পুলে হলে—থাকগে, সে পরের কথা। মোটের উপর বড় চাকুরে বলে সেখানে ভায়ার যা খাতির প্রতিপত্তি—টু শব্দটিও কেউ করতে পারবে না। তা'হলে এই বন্দোবস্তই ঠিক, কি বলিস? ওর আবার ছুটি ফুরিয়ে এল কিনা—দশ বারো দিনের মধ্যেই তাহলে বেরিয়ে পড়তে হবে

পুরোহিৎ ঠাকুর পরম আগ্রহে আমার মুখের পানে চেয়ে নির্লজ্জকটাক্ষে হাসতে লাগলেন। রাগে দুঃখে অপমানে আমার মুখে শক্ত উত্তর এসেও যেন দুটি কম্পিত ওষ্ঠাধরে বাধা পেয়ে

থেমে গেল। সমস্ত লজ্জা গ্লানি ছাপিয়েও রুদ্ধ বেদনার অশ্রু বন্যার মতোই নেমে এল। এ অপমানের প্রতিকার করবার শক্তি আমার নেই—এ কদর্য্যতার বিরুদ্ধে বলবার মতো কোন ভাষাও বুঝি নেই! আমি নিঃশব্দে সেঘর থেকে বেরিয়ে এসে বড় ঘরে গিয়ে ভূমি শয্যায় শুয়ে পড়লাম।

হায়, নিয়তির কি নিষ্ঠুর নির্য্যাতন! জাতী কূল মান সর্ব্বস্ব হারিয়েও কি আমার দুর্গতির শেষ হয়নি? যারা আমাকে সমাজের পাপ—নিজেদের কলঙ্ক বিবেচনা ক'রে জন্মের মতো ত্যাগ করে গিয়েছে, তারাই আজ অসঙ্কোচে শুভাকাঙ্খী সেজে এসেছে অধঃপতনের শেষ সীমায় আমায় টেনে নামাতে! এক অশুভ মুহূর্ত্তের শোচনীয় দুর্ঘটনায় যে পাপ আমায় স্পর্শ করেছে যাদের চোখে তা এতই ভীষণ যে তার ক্ষমা নেই প্রায়শ্চিত্ত নেই—সেই দরদীরাই আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন ঐ ঘৃণ্য পাপকেই সারা জীবনের সম্পদ বলে বরণ করে নিতে।

পুরোহিৎ অনেকক্ষণ আমাকে ডাকাডাকি করে অবশেষে ক্লান্ত হলেন। অনেকক্ষণ তাদের আর কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে ভাবলাম তারা বুঝি এতক্ষণে চলে গিয়েছে। উঠে গিয়ে বসবার ঘরের দরজা বন্ধ করবো ভাবছি এমন সময় উঠানে দাইমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। পুরোহিতের কণ্ঠধ্বনীও অচীরেই কাণে পৌঁছিল। দাইমা আমায় ডাকলেন—আমি দরজা খুলে বের হলাম।

আমাকে দেখেই পুরোহিৎ বললেন—তবে আমরা এখন

আসি সুশীলা, বেলা অনেক হয়ে গেছে। যা বলেছি একটু ভেবে দেখিস, তোর ভালর জন্যই বলেছি আবার একদিন আসবো। তোকে দেখে শুনে গেলাম তোর মাকে গিয়ে বলবো এখন।

আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল যে না আমার কথা কাউকে কিছু বলো না গিয়ে, কিন্তু ঐ লোকটিকে কোন কথা বলতে প্রবৃত্তি হলো না। তারা চলে গেল। দাইমার অনুরোধে অত বেলায়ও আমি রান্না করতে না গিয়ে পারলাম না।

— ১৪ —

আরও কয়েকটি দিন পরের কথা। সে দিন রবিবার। সারাদিন কুমুদিনীর সঙ্গে গৃহ কর্ম্মে কেটে গেছে। সেদিন কুমুদিনীর স্কুল ছিল না বটে, কিন্তু লেপা-পোছা ধোয়া-কাচা, শেলাই প্রভৃতি বহু কাজই ছিল। সেই সব সেরে বিকেলের দিকটায় উঠানে কাঁটাল গাছের ছাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসেছিলাম। দাইমা তখন কাজে বেরিয়ে গেছেন।

আশ্বিনের পড়ন্ত বেলা। আকাশের বুকে হাল্কা সাদা মেঘের টুক্‌রো গুলো ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। কুমুদিনী বই পড়ছিলো, আমি সেই দিকে চেয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ সদর দরজায় ঘা পড়লো। আমরা দুজনেই চম্‌কে উঠলাম।

কুমুদিনী কেমন এক দৃষ্টিতে আমার পাণে চেয়ে রইলো। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে আমার দেরী হল না। বুকের ভিতর কে যেন অলক্ষ্যে ঘা দিতে লাগলো—আজ আবার না জানি কি বিড়ম্বনা। কুমুদিনী হয়তো আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল, তাই আমাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে উঠে রুদ্ধ দরজার সম্মুখে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—কে গা ?

উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন একাগ্র হয়ে উঠেছিল। দ্বারের ওধার থেকে না জানি কোন্ ভয়ঙ্কর নামই ধ্বনিত হয়ে উঠবে !

উত্তর এল—আমি নিখিল, সুশীলার দাদা। তার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চাই

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কুমুদিনী আমার পানে চাইলো। ইঙ্গিতে তাকে দ্বার খুলে দিতে বলে তাড়াতাড়ি আমি শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। নিমেষে সারা মন কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।—সেই নিখিল দা—যে আমার আজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল, একাধারে আমার ভাই, বন্ধু, গুরু—যার মুখে হিন্দু বিধবার মহান আদর্শ, তার নিষ্ঠা সংযম ও পুণ্যব্রতের শত কাহিনী শুনতে শুনতে নিজেকেও তেমনি গড়িয়সী করে তোলবার সঙ্কল্প এটেছি। যার উপদেশে স্বর্গের সোপানে লক্ষ্য রেখে নিজের বিধ্বস্ত জীবনের শোক তাপও তুচ্ছ জ্ঞান করেছি সেই নিখিলদা আজ দুয়ারে দাঁড়িয়ে—আমার এই পাপ কলুষিত দেহ নিয়ে কি করে আজ তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো ? যে

নিখিলদা সুন্দর ওজস্বিনী ভাষায় কতবার আমায় বুঝিয়েছে—বৈধব্য সাজা নয়, ভগবানের দেওয়া পবিত্র বর। যে বজ্র গম্ভীর স্বরে বলেছে, হিন্দু-নারী-জীবনের উদ্দেশ্য ভোগ বিলাশ নয়—স্বামীর ধ্যানে এ তুচ্ছ জীবন কাটিয়ে দেওয়াই সেই মহান উদ্দেশ্য—কেমন করে আজ তার কাছে এ কালো কলঙ্কিত মুখ দেখাবো? তার শেখানো সেই পবিত্র সঙ্কল্পই তো আমি গ্রহণ করেছিলাম, তবে আজ নরকের অতল তলে ডুবে গেলাম কোন অভিশাপে? তারই নির্দ্দেশে সে দিন যে মহান ব্রতের সঙ্কল্প নিয়ে হৃদয়ের পবিত্র পূজা-বেদীতে মঙ্গল—ঘট প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, আজ যে তার এতটুকু চিহ্ন ও নেই। বোধনের পূর্ব্বেই কোন্ এক অলক্ষিত দানবের দারুণ আঘাতে আমার সেই ব্রত ভঙ্গ, ঘট চুর্‌মার্ ও সমস্ত আয়োজন ধুলায় মলিন হয়ে গেছে। আমার পূজা-মন্ত্রের সে পুরোহিতের কাছে কি উত্তর আজ দেবো? হায়, বিনা দোষে ও আমি চির-অপরাধিনী!

হঠাৎ কুমুদিনীর কণ্ঠস্বরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম—বেশ লোক তো তুমি! এদিকে তোমার দাদা বাইরের ঘরে তোমার প্রতিক্ষায় বসে, আর তুমি কিনা—

—এই যাচ্ছি ভাই, বলে চললাম। কাপড়ের আচলে চোখ মুখ পুছে, দ্বিধা-আন্দোলিত-অন্তরে নতমুখে নিঃশব্দ গতিতে ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। নিখিলদা তখনও দাঁড়িয়ে মুহূর্ত্ত খানিক কেটে গেল একটি কথাও সে বললে না।

ধীরে ধীরে চোখ তুলে তার পানে চাইতেই চম্‌কে উঠলাম। তার সেই স্বাস্থ্য-সুন্দর-শরীর আর নেই—সারা মুখে কেমন রক্তহীন বিবর্ণতা—কেমন রোগ-শীর্ণ জ্যোতিহারা ভাব। সমস্ত সংশয় সঙ্কোচ কোথায় ভেসে গেল—সেই মুহূর্ত্তে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস .করলাম—এ কি চেহারা হয়েছে তোমার নিখিলদা, খুব ভুগেছিলে বুঝি?

সে কোনই উত্তর দিল না। আমি বললাম—দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ, বসো!

একটু ইতস্ততঃ করে বসে সে বললো—হ্যাঁ বেশীক্ষণ যখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না তখন বসতেই হবে।

এ কি রকম কথা? কত কাল পরে আজ নিখিলদার সঙ্গে দেখা, তাতে আবার আমার মাথার উপর দিয়ে সম্প্রতি যে দারুণ ঝড় বয়ে গেছে তাতো সে জানে! সে জানে যে মা ও মামা অতি নিষ্ঠুরের মতো আমায় পরিত্যাগ করে গেছে। তবু কি আমার জন্য নিখিলদার বুকেও এতটুকু সহানুভূতি—তার মুখেও সামান্য স্নেহ সম্ভাষণ টুকুও নেই? কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—অসুখ খুব শক্ত হয়েছিল বুঝি?

হাঁ, জমের দুয়ার দেখে এসেছি, কিন্তু ফিরে না এলেই ছিল ভালো। যাদের সংসারে এত বড় কেলেঙ্কারী তাদের বেঁচে থেকে লাভ তো শুধু অপমান ও টিট্‌কারী ভোগ। উঁচু মাথা যদি চির দিনের জন্য নীচু হয়েই গেল, তবে আর লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো কোন মুখে!

আমার দুঃখ তাপ দগ্ধ জীবনে অকৃত্রিম বন্ধু বলে এতদিন যাকে জেনেছি—যার ঐকান্তিক স্নেহ ও সহানুভূতিতে একান্ত চিত্তে নির্ভর করে মনে বল পেয়েছি—আজ সেই নিখিলদার মুখেও শ্লেষের কথা! দারুণ অভিমান ও দুঃসহ বেদনায় আমার সারা বুক উথ্‌লিয়ে উঠলো।

একটু থেমে নিখিলদা আবার বলতে লাগলো—তোর উপর এতদিন কতখানি নির্ভর, কত আশাই না করেছি। আমার বন্ধুদের কাছে তোর গুণের কত প্রশংসা করেছি—শুনে তারা মুগ্ধ হয়েছে। কি করে আবার তাদের কাছে গিয়ে এ মুখ দেখাবো? আমি চেয়েছিলাম—তোকে আদর্শ করে গড়ে তুলবো, সবার উপরে তুলে ধরবো··আর তুই কিনা সে সমস্ত তুচ্ছ করে সবার নীচে নেমে গেলি! হিন্দুর মেয়ে যে মৃত্যু বরণ করেও তার সতীত্ব রক্ষা করে, আর তুই কিনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে হয়ে—আশৈশব সুশিক্ষা সদুপদেশ পেয়ে—শেষ কালে এম্‌নি করেই ডুবলি।

আমি আর সইতে পারলাম না। ক্রন্দন উচ্ছলিত স্বরে বললাম—তুমিও কি মনে কর ইচ্ছে করে আমি এই কলঙ্কে ডুবেছি—নিরুপায় বলে আমার উপর কেউ জুলুম করেনি? তারপর আত্মীয় পরিজন সমাজ—এরাও নিষ্ঠুর অবিচারে আমায় ত্যাগ করে নি?

—দেখ্, ওসব মিথ্যা ওজর আমার কাছে চলবে না। পরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের পাপের বোঝা আরও

বাড়াসনি। যে মেয়ে কায়-মনো-বাক্যে সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তার সতীত্ব নষ্ট করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সে কথা বলেছেন। আর্য্য নারীর আদর্শ কত মহান তা জেনেও যখন তুই নারী-ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারিসনি, তখন আত্মীয় স্বজন ও সমাজের কাছে অবিশ্যি অপরাধী। সমাজ হ'ল জাতীর প্রাণ, তার ব্যবস্থায় দোষ ধরতে তুই কে? বিজাতী বিধর্ম্মীর কুশিক্ষায় কত হোমরা চোমরাই না হিন্দু সমাজের কত নিন্দা প্রচার করেছে সমাজকে ভাঙ্তে গড়তে চেয়েছে, তারা আজ কোথায়? কিন্তু হিন্দু সমাজ পুর্ণ গৌরবেই বজায় রয়ে গেছে—কারো সাধ্যি নেই তাকে ম্লান করে। পাশ্চাত্য সমাজে পাপের স্রোত বয়ে চলেছে তাই দিন দিনইতার অধঃপতন হচ্ছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ কখনো পাপের প্রশ্রয় দেয়নি, তাই এত দুর্ভাগ্য সত্বেও এতকাল টিকে রয়েছে। হিন্দু সমাজ লোকসংখ্যায় ছোট হতে রাজি, কিন্তু আদর্শ ছোট করতে রাজি নয়। তার সনাতন বিধি ব্যবস্থা যার ভাল না লাগে সে সরে পড়ুক। যাক্ এসব কথা বলতে তোর কাছে আসিনি—তুই এর কি বুঝবি! শুন্‌লাম কে এক খ্রীষ্টান মাগী তোকে নাকি আদর দেখিয়ে তাদের আড্ডায় নিয়ে যেতে এসেছিল না গিয়ে খুব ভালই করেছিস। কিন্তু ওরা ভয়ানক নাছোরবান্দা জাত, আবার কবে এসে প্রেম দেখাতে সুরু করবে কে জানে! খবরদার যাবিনে। হিন্দুর মেয়ে দিন্দু সমাজে পতিতা হয়ে থাকাও বরং ভাল, তবু বিদেশী

বিধর্ম্মীর আশ্রয়ে যেতে নেই। বুঝলি ওতে তোর একার নয়, সমস্ত সমাজ ও জাতীর অপমান হয় বুঝলি। এই তো—এরা নাকি শুনেছি ভাল লোক, আপাতত এখানেই থাক, তারপর আমি পাশ করে বেরিয়ে কিছু কিছু সাহায্য করবো।

অনেক অপমানই তো এ অবধি সয়ে এসেছি—কোনই প্রতিবাদ করিনি, করতে পারিনি। কিন্তু নিখিলদার কাছেও এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার পেতে পারি কখনো তা মনেও ভাবিনি, তাই আজ আর কিছুতেই সইতে পারলাম না, বললাম—অপার করুণা তোমার! কিন্তু তোমাদের চোখে তো আমি পতিতা কেন আর তোমরা পতিতাকে সাহায্য করবে! তোমাদের দয়া আমি চাইনে। বিনা বিচারে তোমরা আমায় জন্মের মতো ত্যাগ করেছ, আমি তোমাদের আর কোন দয়া চাইনে—আমিও ভাব্‌বো আমার কেউ নেই—কোন দিনই ছিল না।

বলতে বলতে আমার দুই চক্ষু ভরে অশ্রু নেমে এল, তা রোধ করতে না পেরে তখুনি সেঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম! নিরালা গৃহকোণে আমার শত অশ্রু-সিক্ত শয্যা-ভারই আশ্রয়ে নিজেকে সপে দিলাম। হায় ঠাকুর, আমার শেষ বন্ধনটুকুও যদি ছিন্ন করে দিলে—সব আশাই যদি ঘুচিয়ে দিলে, তবে আর কেন—আমায় নিস্তার করো—মুক্তি দাও।

— ১৫ —

নিখিলদাকেও হারালাম। আমার আশৈশব সঙ্গী, চিরসুহৃদ, পরমসহায় নিখিলদা। যার উপদেশ, যার সহানুভূতি, যার অনুপ্রেরণায় জীবনের কতদিন কত নূতন আনন্দ—নূতন আলোর সন্ধান পেয়েছি; আজ আমার এই দুর্দ্দিনে সেও আমায় ছেড়ে গেল! তবে আমার এই সর্ব্বহারা—এই ঘৃণিত কলঙ্কিত জীবনে আর রইল কি? যে অসহায়া নির্য্যাতিতা নারীর জন্য সমাজে বিচার নেই—আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে স্নেহ নেই—বন্ধুবান্ধবের প্রাণে সহানুভূতি নেই—তার আর বেঁচে থাকা কেন? আমার কৈশোরের সেই স্নিগ্ধসৌরভময় শ্যামল কোমল সুরূপা পৃথিবী—আজ আমার চোখে একটা বিরাট মরুভূমি—উত্তপ্ত, ঊষর, ভয়ানক।

সমস্ত জীবন যেন আমার এক মুহূর্ত্তে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট হয়ে চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো। এই মাটির বুকেই তো আমার শৈশবের সংক্ষিপ্ত দিনগুলি কি আনন্দেই না কেটে গেছে। আত্মীয় প্রতিবেশী, চেনা অচেনা, কতজনের কত অযাচিত অফুরন্ত স্নেহ সোহাগ-আশীর্ব্বাদের সুকোমল আবরণে আমায় ঘিরে রেখেছিল। আমার সেই দিনের জগত ছিল কত সুন্দর, কত মধুর! এমনি করেই তো তখন দিন কাটছিল—এর ব্যতিক্রমের কল্পনাও তো কখনো করিনি। তা সত্ত্বেও হায়, আমার উঠন্ত—কৈশোরেই জীবনের সুখ-স্বপ্ন হটাৎ একদিন ভেঙ্গে গেল—আমার বৈধব্য

ঘটলো। তখন ভাল বুঝিনি, সে দুর্ভাগ্য কত বড়। বুঝিনি বলেই হয়তো ব্রত নিয়ম উপবাসের বাহুল্য সত্বেও জীবনটা অসহ বলে মনে হয়নি! তারপর পিতার মৃত্যুর দারুণ আঘাতও সহ্য হলো, নিখিলদার বন্ধুত্ব পেয়ে। কিন্তু যতই বয়স বাড়তে লাগলো—কি একটা অভাব—কি একটা হতাশ্বাস—থেকে থেকে বুকের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগলো। কখনো বা রঙ্গিণ কল্পনার কুহকে অবাধ্য মনকে আশ্বস্ত করেছি—কখনো বা পুণ্য সঙ্কল্পের কশাঘাতে তাকে দমন করে রেখেছি। এমনি করেই দিন চলেছিল, তারপর হটাৎ আমার এই সর্ব্বনাস। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় জীবনের সব গ্রন্থি গুলিই যেন হঠাৎ একদিন ছিড়ে গেল—সবাই আমায় ত্যাগ করলো। বঞ্চিতা নারীজীবনের যা কিছু কাম্য সেই সব দুর্দ্দমনীয় প্রলোভনই তো আকুল আগ্রহে আমায় সেদিন ডেকেছিল। যাদের স্নেহ মমতার আকর্ষণে সে সব আমি প্রত্যাখ্যান করে এসেছি, তারা তো কই আমায় চাইলো না—গভীর তাচ্ছল্যভরে আবর্জ্জনার মতোই ফেলে চলে গেল। এতদিনের স্নেহের বন্ধন এক নিমেষেই ছিন্ন করে দিল। তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? কিসের আশায় এ দুর্ব্বহ জীবনের ভার বইবো।

কুমুদিনী এসে আমায় টেনে তুললো। চোখ মুখ ধুয়ে তার সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সে সস্নেহে আমার হাতখানা ধরে বললো—এ সব ঘটনায় তুমি যদি এত অস্থির হয়ে পড়, তবে তো দেখছি কেঁদে কেঁদে তোমার দিন যাবে। দেখছো না আমরা

কেমন শক্ত হয়েছি। আঘাত অপমান এখন আর আমাদের গায়েই লাগে না, নইলে আমার মা কিনা আজ বিনোদিনী দাই !

মুহূর্ত্তে তার চোখ মুখ আরক্তিম হয়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে একটু হেসে বললে—লোকের কাছে শিষ্টাচার, আন্তরিকতা, সহানুভূতি ইত্যাদি আশা করলে তবেই বঞ্চিত হতে হয়, এবং তা থেকেই দুঃখ আসে। মা ও আমি কারু কাছে কিছু প্রত্যাশা করিনে বলেই আমাদের দুঃখ কষ্ট কমে গেছে। পতিতা বলে তোমাকে যারা ত্যাগ করে গেছে, তাদের মতামতকে তুমি অত বড় করে দেখ বলেই মনে এত ব্যথা পাও। অন্যায় অবিচারে তারা যদি তোমায় বর্জ্জন করে থাকেন, তবে কি তারা কর্ত্তব্যে পতিত হন নি। তাছাড়া ভেবে দেখো—কেঁদে কেটে ভেঙ্গে পড়ে কোনও লাভ নেই, ওতে দুঃখ কষ্ট বেড়েই যায় ; বরং সব অবস্থাতেই যদি ভগবানে বিশ্বাস রেখে মনুষ্যত্বের পথ ধরে চলা যায়, তাহলে সমাজ বা পরিজনের নিষ্ঠুরতায় আমাদের জীবন একেবারেই পঙ্গু হতে পারে না। অনেক ঘা খেয়ে আমরা শক্ত হয়েছি, তোমাকেও হতে হবে। দেখছো না আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, দেশ, গুরু, পুরোৎ কারু সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই ! তারা যদি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে, আমরাই বা কেন তাদের ছেড়ে থাকতে পারব না ! দিব্বি নির্ঝঞ্ঝাটে নিরালা আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে—মন্দ কি ?

এই বলে সে আমার চুল আচড়াতে সুরু করলো—আজও আপত্তি মানলো না। আমি ভাবতে লাগলাম সমাজ বর্জ্জিতা এই

দু'টি নারীর কথা! এদের জীবনের অন্তরালে কি যেন একটা রহস্য আছে। কুমুদিনীর কথায় আজ তো স্পষ্টই আভাস পাওয়া গেল। তাছাড়া, এদের মতো পরিস্কার পরিপাটি ঘর সংসার, সুন্দর চাল চলন, মার্জ্জিত কথাবার্ত্তা—এতো সচরাচর দেখা যায় না। দাইমা যদি সত্যিকারের দাইই হবেন তবে এ সব শিখলেন কোথায়?

আমাদের গ্রামের দাই ন'কড়ির মা র কথা মনে হতে হাসি পেল। যেমনি তার চেহারা তেমনি তার কথাবার্ত্তার শ্রী আবার তেম্নি সে নোংরা। তাকে ছুঁলে দাইমাও বুঝি চান না করে পারেন না। দাই মা তবে আগে দাই ছিলেন না, জাত যেতে তবে দাই হয়েছেন। এরা নির্ঝঞ্ঝাটে নিরালা থাকতে ভালবাসে, কিন্তু আমি আসা অবধি তো লোকজনের আনাগোনা ও ঝঞ্ঝাট আরম্ভ হয়েছে। আমার জন্য এই অনাবশ্যক উৎপীড়ন এরা কত দিন সইবেন!

পরদিন বিকেলে কে একজন লোক এসে দাইমাকে ডেকে কোথায় নিয়ে গেল। তিনি যখন ফিরে এলেন সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমরা তখন ঘরে আলো জ্বলে মেজেতে মাদুর বিছিয়ে শরৎবাবুর "চন্দ্রনাথ" পড়ছিলাম। দাইমা স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কিন্তু আজ তাঁর মুখ দেখে মনে হলো সে মুখ শুধু গম্ভীর নয়—চিন্তা-ক্লিষ্ট

তিনি হাত মুখ ধুয়ে আমাদের পাশে এসে বসলেন এবং ক্ষণকাল কি চিন্তা করে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—ঈশ্বর

যখন যাকে পরীক্ষা করেন, তন্ন তন্ন করেই করেন। সাহসে বুক বাঁধলে—তাঁর উপর অটল বিশ্বাস রাখলে, তবেই তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তোমাকেও তাই করতে হবে সুশীলা! কালী উকিল আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, গিয়ে দেখি যে সাব্‌-ইন্‌স্পেক্টর পরেশও সেখানে বসে। তাদের হাতে কে একটা মস্ত জমিদার আছে—সে নাকি তোমাকে চায়। কালী উকিল আমাকে বল্‌লে যে এই ছুড়িটাকে পটিয়ে তুমি আমাদের হাত করে দাও একশ' টি টাকা বখ্‌শিষ্‌ পাবে। তাই যদি পারতাম তবে একঘরে হয়ে—দেশ গাঁ ছেড়ে এখানে এসে দাইএর কাজ করতে হতো না। পরেশ আবার কি বল্‌লে জান? সে বললে—যদি ইচ্ছে করে ছুড়িটাকে আমাদের হাতে না দাও, আমরা যে করেই হোক ওকে হাত কোরবই। মাঝখান থেকে তোমার বখশিষের টাকাটা ফাঁকি যাবে। যা হোক আমি রাজী হয়ে এসেছি এবং তোমাকে পটাবার জন্য এক সপ্তাহের সময় নিয়েছি। এখনই তুমি সেই মেম সাহেবকে একটা চিঠি লিখে দাও—রাত্রি বেলাই আমি চুপি চুপি ডাকে দিয়ে আসবো। পরশু দিন তিনি চিঠি পাবেন—পেয়ে যেন আর দেরী না করেন। টেলিগ্রাফ্‌ করা যাবেনা, পরেশ জানতে পারবে। তিনি সময় মতো না এসে পড়লে যে ভয়ানক বিপদ তা বুঝিয়ে লিখো।

আমি সেখান থেকে উঠে বিছানায় গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম! উঃ কি নিষ্ঠুর বিধিলিপি—সর্ব্বস্বান্ত হয়েও আমার নিস্তার নেই! কি এমন মহাপাপ করেছি,

যে জন্য আমাকে সমাজচ্যুত করেও আমার প্রতি সমাজের আক্রোশ মিটে নি। নরকের অতল তলে না গিয়ে বুঝি আমার নিষ্কৃতি নেই, কিন্তু যাঁরা আমায় সেপথে টানছেন তাঁদের জন্য ত সমাজের স্নেহ অফুরন্ত? তাঁরা পুরুষ, শক্তিমান— তাঁদের আবার পাপ কি—তাঁরা যা করেন সব কিছুই পুণ্য।

চিঠির কাগজ কলম ইত্যাদি নিয়ে কুমোদিনী এসে ডাকলো। বুঝলাম তার কথাই ঠিক—বিপদ দেখে হাল ছেড়ে দিলে বিপদ কমবে না। তাই ছু'জনে পরামর্শ করে অবশেষে চিঠি খানা লিখে ফেললাম।

চিঠি শুনে দাইমা খুসীই হলেন এবং ঐ শীতের রাতে অতটা পথ হেঁটে গিয়েও ডাকে দিয়ে এলেন কারণ, দিনের বেলা চিঠি ডাকে দিতে গেলে যদি কেউ দেখে ফেলে, তবে হয়ত কথাটা গিয়ে সাব্‌ ইন্‌স্পেক্‌টার বাবুর কাণে পৌছাবে। তাহলে চিঠি গন্তব্য স্থানে যাবে কিনা সন্দেহ।

ঐ ঘটনার পাঁচ দিনের দিন সেই মেম্‌সাহেব ফের কার্ত্তিকপুরে এলেন এই ক'টি দিন যে কি আতঙ্কে আমাদের কেটেছে অন্তর্যামীই জানেন। রাত্রি বেলা পালা করে আমরা এক এক জন জেগেছি, তাছাড়া জনৈক প্রতিবেশীর দুর্দ্দান্ত একটা কুকুর কদিনকার জন্য ধার করে এনে বারান্দায় বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাতেও দাইমা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, দিনের বেলাও ঐ ক'দিন আমাকে একা ফেলে মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি বাসার বাইরে যান নি। কুমুদিনী স্কুল থেকে ফিরলে

তবে দাইমা কদাচিৎ বাইরে গিয়েছেন বটে, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। এর মধ্যে দু'দিন সাব্-ইন্স্পেক্টর্ বাবু এসেছিলেন কিন্তু দাইমা চুপি চুপি কি সব বলে তাকে বিদায় দিয়েছেন।

বেলা নটায় মেম্সাহেব আমাদের বাসায় এলেন এবং ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে সব ব্যাপার জেনে নিলেন। তিনি বললেন যে এসব ঘটনা শুনে তিনি দুঃখিত হন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য হন না; কারণ, এই রকম যত গুলি দুর্ঘটনার সন্ধান তিনি নিয়েছেন, সর্ব্বত্র একই কাহিনী শুনেছেন। এর কারণ তাঁর মনে হয় যে, একবার কোনও ক্রমে যে বালিকার পদস্খলন হয়েছে, চরিত্রহীন লোকের চোখে সে এতই পতিতা বলে গণ্য হয় যে ভোগ বাসনার সামগ্রীর চেয়ে বড় বলে তাকে তারা আর ভাবতেই পারে না। যে অসতী, তার ত আর সতীত্ব নাশের ভয় নেই, তাই তার প্রতি দুর্বৃত্তদের লোলুপ দৃষ্টি। এসব অভাগিনীদের সমাজচ্যুত করে যে দুশ্চরিত্র লোকদের পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গ শেষ করে তিনি বললেন যে বেলা দু'টায় ষ্টেশনে ষ্টিমার আসে এবং নৌকায় ষ্টেশনে যেতেও প্রায় একঘণ্টা লাগে, কাজেই সাড়ে-বারোটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নৌকায় ওঠা চাই।

তিনি আরও বললেন, তিনি ডেপুটি বাবুর সঙ্গে দেখা করে ডাক্ বাংলায় ফিরবেন এবং সাড়ে-বারোটার মধ্যে তৈরী হয়ে এখানে আসবেন।

মেম্‌সাহেব চলে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে চাল-ডাল এক সঙ্গে চড়িয়ে ভাবতে লাগলাম—আত্মীয় স্বজন ছেড়ে—স্বজাতী স্বধর্ম্মী ছেড়ে, এই যে এক অপরিচিতা—বিদেশীনির আশ্রয়ে চললাম—কে জানে এর পরিণাম কি! কিন্তু এ বিপদে এ ছাড়া আমার গতিই বা কি? ভগবান যে ব্যবস্থাই করুন মাথা পেতে নিতেই হবে।

— ১৬ —

উপরোক্ত ঘটনার পর প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। আমি এখন চাঁদপুরে মুক্তি-ফৌজের অধিবাসীনী প্রথম যেদিন এই আশ্রমটি দেখি সেদিন সত্যি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সহর থেকে চার মাইল দূরে নদীর উপকূলে মুক্তি ফৌজের এই আবাসটি যেমনই সুন্দর তেমনই পরিচ্ছন্ন পরিপাটি, দূর থেকে ঠিক ছবিটির মতো দেখায়। চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তীর্ণ ভূমির মাঝখানে দ্বিতল এক অট্টালিকা—সম্মুখে সবুজ ঘাসে-ঢাকা প্রশস্ত ময়দান; তাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করে লোক চলাচলের রাঙা পথ ফটক্ থেকে আফিস্ ঘরের সিঁড়িতে গিয়ে পৌঁচেছে। বাগিচার চারি পাশেই নানা জাতীয় দেশীয় ও বিলাতী ফুলের সারি, নানা রং‌এর ফুল পাতায় বাগানটিকে

অপূর্ব্ব সৌষ্টবময় করেছে। এক রকম সবুজ লতা প্রাচীরটিকে প্রায় ছেয়ে ফেলেছে—তার থোকা থোকা গোলাপি রংয়ের ছোট ছোট ফুল গুলি হল্‌দে দেয়ালের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। এক কথায় স্থানটি দেখলেই চোখে লেগে থাকে এবং বুঝতে বিলম্ব হয় না যে বহু যত্ন ও সতর্কতার ফলে এই সৌন্দর্য্য রচিত।

দোতলা বাড়ীর পশ্চাতে অপরিসর আঙ্গিনা তারপর একতলা এক দালান, তার পিছনে আম কাঁটাল লিচু প্রভৃতি ফলের বাগান। তারপর পুকুর, তারই এক পাড়ে গরুর ঘর, মুরগির নিবাস, মালিদের বাসস্থান ইত্যাদি এবং অন্য তিন পাড়ে শাক্‌সব্জীর বাগিচা। এই আশ্রমের অনতিদূরে সেণ্ট-জোহেপস্ বয়েজ স্কুল ও তৎসংলগ্ন গ্রীজা। প্রকৃত পক্ষে এই মুক্তি ফৌজের আশ্রমটিও ঐ গ্রীজার অধীন, অর্থাৎ এ সব ক'টি প্রতিষ্ঠানই একই মিশনারী সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত।

এই বাড়ীতে নীচে ও উপরে, আটখানি করে ষোলখানি কাম্‌রা, তার মধ্যে উপরে একখানি ও নীচে একখানি ঘর খুব বড়; নীচের বড় ঘরখানি মেয়েদের পড়বার ঘর, আর উপরের বড় ঘর খানিকে চেপল্ বা উপাসনাগার বলে। বাড়ীতে ঢুকে ডানদিকের যে ঘর তাতেই আফিস্ আর তার পাশের ঘরেই সিষ্টার—(সেই মোটা মেম্-সাহেবকে এখানে সকলে সিষ্টার বলে এবং তিনিই এখানকার কর্ত্রী—) থাকেন। পিছনের একখানি ঘরে দরজী বিভাগের কাজ হয়, অন্যান্য

ঘর গুলিতে মেয়েরা থাকে। উপরের সবগুলি ঘরই মেয়েদের থাকবার জন্য—অবশ্যি চেপল্ বাদে। পিছনের একতলা দালানটিও নেহাৎ ছোট নয়, ওতেও ছয়খানি বেশ বড় বড় ঘর। রান্না খাওয়া ও ভঁাড়ারের জন্য তিনখানি নির্দ্দিষ্ট, অন্য তিনখানিতে চরকা, তাঁতের কাজ, মোম্‌বাতি তৈরী করা হয়; আর আম আনারস প্রভৃতি ফলের দিনে চাটনি জ্যাম্ প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

এই আশ্রমে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান—উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী নির্ব্বিশেষে মোট আটত্রিশটি বালিকা ও স্ত্রীলোক আশ্রয় লাভ করেছে। প্রত্যেকের জন্যই নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কাজ। বাগানের মালি ভিন্ন অন্য কোন চাকর বা ঝি নেই। ঘর সংসারের কাজ ছাড়াও শেলাই, চরকা কাটা, তাঁত বোনা আছে-- মোম্‌বাতি তৈরি করা হয়—বাঁশ-বেতের নানারূপ সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। তাছাড়া প্রতি বিশ্‌বুধ বারে কাপড় কাচার পালা—ভিটি বাঁধানো একখানি টিনের ঘরে' ধুপিখানা। স্তূপীকৃত কাপড় একদিনেই কাচা, শুকানো, ইস্ত্রি করা সব হয়ে যায়—ঠিক ধুপিদের উপায়ে নয়, কয়েকটি যন্ত্র সাহায্যে। গরু দিয়ে ঐ কলগুলি চালান হয় এবং রান্না ঘরে উনান্ বা ষ্টোভের সঙ্গে যে বয়লার আছে তা থেকে পাইপ্ দিয়ে কাপড় কাচা কল দুটিতে গরম জল নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাপড় কাচা ও নিংড়ানো কলে হয়, এবং সে সংক্রান্ত বাকী সব কাজ হাতেই করতে হয়। কাপড় কাচা ও নিংড়াবার যাবতীয় কাজের ভার চারটি মেয়ের উপর ন্যস্ত। কিন্তু ইস্ত্রির

কাজ করতে হয় প্রত্যেককেই। ইস্ত্রি করা তেমন কঠিন কাজ নয়—আমিও মোটামুটি শিখে নিয়েছি।

এ সব ছাড়াও বিস্তর হাঁস, মুরগী ও ছাগল আছে। গরুর সব কাজ মালিরাই করে, কিন্তু হাঁস, মুরগী ও ছাগলগুলির পরিচর্য্যার ভার দুটি মেয়ের উপর। এ সব কাজ থেকে বেশ আয় হয়—ব্যাপারীরা এসে জামা, কাপড়, মোমবাতি, ডিম, দুধ ইত্যাদি কিনে নিয়ে যায়। বাগানের ফল তরকারিও মাঝে মাঝে বিক্রি হয়।

এই আশ্রমে উপরের একটি ঘরে চারখানি শয্যার মধ্যে একখানি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হলো। আমি এক কাপড়ে এসেছিলাম বললেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এখানে এসেই চারখানি কাপড়, চারটি সেমিজ, দু'খানি গামছা, দু'টী বালিসের ওয়াড়, দু'খানি বিছানার চাদর ও একটি ট্রাঙ্ক্ পেলাম। সত্যি বটে এ সবই নূতন নয়, তবে বেশ মজবুত ও পরিষ্কার।

আমি নিজ হাতে রান্না করে একবেলা খাই ও দরজি বিভাগে কাজ করি, আর যে দু'ঘণ্টা কাল লেখা-পড়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট সেই সময়ে সিষ্টারের উপদেশে মিস্ নন্দীর কাছে ইংরেজি ও অঙ্ক শিখি। ক্রমে আশ্রমের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হতে লাগলো, কারো কারো সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতাও হলো, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমার কলঙ্কের কাহিনী কেহই জিজ্ঞাসা করলো না—আমিও কারু অতীতের সংবাদ জানতে চাইলাম না।

এই আশ্রমে এসে দেখতে দেখতে আমার একটি মাস কেটে

গেল। ক্রমে আমি এখানকার দৈনন্দিন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম। ভিন্ন ধর্ম্মী ও ভিন্ন জাতীয় মেয়েদের স্পর্শ এখন আর আমার অপবিত্র বোধ হয় না, কারণ এই একমাস অনবরত এদের সংস্পর্শে থেকে বেশ বুঝতে পেরেছি যে এখানকার শিক্ষার গুণে, মেয়েদের আগেকার সেই নোংড়ামি ও অসতর্কতা বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে না। তাছাড়া কাজ-কর্ম্মে, লেখা-পড়ায়, উপাসনা ও উপদেশাদিতে সারাদিন এবং রাত্রিরও কয়েক ঘণ্টা এমনই বিভক্ত যে ঝগড়া বিবাদ ও কুৎসা করবার অবসর অতি অল্প। সম্ভবতঃ এখানকার অন্যান্য বালিকারা আমার মতো এমন কলঙ্কিনী নয়! কিন্তু সংসার সমুদ্রের যে সকল রহস্যময় ঘটনার স্রোতে ভেসে নানাদিক থেকে এতগুলি বালিকা মুক্তি ফৌজের এই আশ্রম তরীতে এসে জুটেছে, তা উদ্‌ঘাটিত করবার কৌতূহল থাকলেও কেউ তাতে অগ্রসর হয় না, পাছে নিজ জীবনের গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে সেই আশঙ্কায়।

অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আজকাল আমিও চেপোলে যাই। প্রথম প্রথম যিশু খ্রীষ্টের নাম ও প্রশংসা শুনতে আমার কেমন লাগতো, কিন্তু এখন সয়ে গেছে। এদের সব কথাই যে আমার ভাল লাগে তা নয়, তবে এরা যে বলেন, অনুতাপানলে সকল পাপ দগ্ধ করে মহাপাপীও মুক্তি লাভ করতে পারে, সে কথা আমার খুব ভাল লাগে। তা ছাড়া কত সদুপদেশ, কত আশার বাণী এখানে শুনতে পাওয়া যায়। সিষ্টার নিজেই প্রত্যহ বেদীর নীচে দাঁড়িয়ে উপাসনা

করেন ও উপদেশ দেন, কেবল মাত্র রবিবার প্রাতে গ্রীজার পাদ্রি এসে বেদীতে দাঁড়িয়ে ইংরাজিতে উপাসনাদি করে যান।

এই মুক্তি-ফৌজের বাসিন্দাদের মধ্যে শুনেছি অধিককাংশই বিধবা, কিন্তু এক চারুশীলা বাদে আর কেউ বিধবার বেসে থাকেন্ন। আর সবাই পাড়ওয়ালা সাড়ী পরে এবং মাছও খায়। চারুশীলা ছোট চালা ঘরে একবেলা সহস্তে রান্না করে খায় এবং চরকা কাটায় সে এখানে অদ্বিতীয়। আগে আমিও আলাদা রান্না করে খেতাম কিন্তু এখন চারু ও আমার রান্না এক সঙ্গেই হয়, কারণ সেও ব্রাহ্মণ কন্যা এবং অতি চমৎকার মেয়ে।

সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যা বেলায় মেয়েদের একঘণ্টার ছুটী বাগানে বেড়াবার। তবে যাদের যেদিন রান্নার পালা তারা সেদিন ঐ ছুটী পায় না। প্রায়ই যেমন ঘটে তেমনি একদিন কর্ম্মক্লান্ত দেহে চারু ও আমি সন্ধ্যা বেলায় একসঙ্গে আম বাগানের দিকে পায়চারি করছিলাম, হঠাৎ আরদালি তরলা এসে খবর দিল যে সিষ্টার আমায় তাঁর অফিসে ডেকেছেন।

আফিস ঘরে ঢুকেই দেখি সাহেবী কাপড় পরা এক ভদ্রলোক ও সেখানে বসে। আমাকে দেখেই কেন যে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন বুঝতে পারলাম না। সিষ্টার একখানি চেয়ার দেখিয়ে আমায় বসতে বল্লেন। সিষ্টারের সাক্ষাতে অনেক মেয়েকেই আমি চেয়ারে বসতে দেখেছি, তবু কেমন আমার

সঙ্কোচ বোধ হলো। আমাকে ইতঃস্তত করতে দেখে আবারও তিনি বসতে বললেন, পাছে অবাধ্য মনে করেন সেই ভয়ে নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসে পড়লাম। তখন সিষ্টার আমার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন—সুশীলা, ইনি হচ্ছেন মিঃ রায় পশ্চিমে মজিদ্‌গঞ্জ্ থেকে এদ্দূরে এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমি অবাক বিস্ময়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে একবার চাইলাম—আর কখনো তাঁকে দেখেছি বলে মনে হলো না।

সিষ্টার বলতে লাগলেন—মিঃ রায় কাগজে তোমার কাহিনীটি পড়ে স্থির থাকতে পারেন নি, অদ্দূর থেকে ছুটে এসেছেন তোমায় উদ্ধার করতে। ইনি বলেন যে দুর্বৃত্তের হাত থেকে যাকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি তার কাছে সমাজই অপরাধী, উল্টে তাকে শাস্তি দিতে যাবো আমরা কোন্ মুখে? মোহাচ্ছন্ন সমাজ যদি দুর্ব্বল বলে নির্দ্দোষীকেই অপমান করে, সাজা দেয়—ইনি বলেন যে সে অপমান, সে শাস্তি ইনিও তোমার সঙ্গে ভোগ করতে প্রস্তুত। এক কথায় মিঃ রায় তোমাকে বে করে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে, অথবা তোমার সঙ্গে পতিত হতে চান। তোমার বড়ই সৌভাগ্য সুশীলা, যে এমন একজন মহৎ লোককে পরম পিতা পাঠিয়েছেন তোমার উদ্ধারের জন্যে।

সিষ্টারের কথায় আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। এও কি সম্ভব!—একে বিধবা তাতে এই কলঙ্ক—এ সব জেনেও

কি কেউ কখনো বিয়ের কথা তোলে? সত্যি কি এই ভদ্রলোক এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করেছেন! নিজের বিয়ের কথা লোকে বলেই বা কি করে?

সিষ্টার আরও বললেন যে ইনি মহা বিদ্বান লোক—আমেরিকার কোন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন এবং বহু দেশ মহাদেশ ভ্রমণ করেছেন। তবে যে মাত্র দেড়-শ টাকা বেতনে মজিদ্‌গঞ্জ্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টারী করছেন, তার কারণ, ছেলে পড়াতে ও তাদের সংসর্গ ভালবাসেন বলে। ওঁর যা আয় তাতে একটু হিসেব করে চল্লে তোমাদের খরচ চলে যাবে। আর কায় ক্লেশে থাকতেও যদি হয়, তবু এমন লোকের সঙ্গই যে পরম লাভ।

আমি কিছুই বলছি না দেখে মিঃ রায় একটু মৃদু হেসে এবার নিজেই বললেন—আমি এখানে আসবার আগে ভেবেছিলাম যে এদ্দিনে একটা সৎ কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি। এই লাঞ্ছিতা মেয়েটিকে বে করে—সারা জীবনে এই একটা মাত্র ভাল কাজ করেই নিজের ব্যর্থ জীবনটা সার্থক করেছি বলে মনকে সান্ত্বনা দেবো। কিন্তু ওঁর সৌন্দর্য্য দেখে—চোখে মুখে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখে—এখন ঠিক বুঝতে পারছি না যে ইনি যদি আমার মত একটা ভবঘুরেকে বে করতে রাজি হ'ন, তাহলে সেটা কেমন হবে। আমার এঁকে দয়া করা হবে না এঁরই আমাকে দয়া করা হবে!

তাঁর কথা শুনে লজ্জায় আমি মাথা নিচু করে রৈলাম।

তখন সিষ্টারের সঙ্গে ইংরাজিতে তাঁর কি সব কথা হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সিষ্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বল সুশীলা, ভগবানের এই অপ্রত্যাশিত দান নিশ্চয়ই তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না!

সিষ্টারের কথা শেষ হতেই মিঃ রায় বললেন—আপনি জবাব দেবার আগে আপনাকে আমার জানিয়ে রাখা উচিৎ যে আমি অতি নিঃস্ব—বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি এখন আর আমার কিছুই নেই। বংশের পরিচয় দিয়েও বড়াই করবো না, কারণ যে বংশের ছেলে মেয়েরা বর্ত্তমানে মহত্বের কোন পরিচয় দিচ্ছে না, তাদের মুখে সুদূর অতীত যুগের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করা সাজে না—পুরাণো ভাল মন্দ সব তামাদি হয়ে গেছে। এ যুগে বড় হতে হলে বড় কাজ করে বড় হতে হবে। এই আমার মত। আমি বড় নই, আর বে'র লাভ লোকসান কি আপনার রূপ গুণের কথা ভেবেও আমি আসিনি। আমি এসেছি সমাজের এই গুরুতর অবিচারের প্রতিবাদ ও সাধ্যমত প্রতিকার করতে। আপনাকে বে করে সমাজকে আমি বলতে চাই যে, বিনা অপরাধে পতিতা' বলে যে অভাগিনীকে তুমি দূর করে দিয়েছ, হে আমার রুগ্ন, ভগ্ন, মোহাচ্ছন্ন সমাজ, ন্যায়ের চোখে সে পতিতা নয়, এ রূপ নির্ম্মম অত্যাচারের অপরাধে তুমিই দিন দিন রসাতলে যাচ্ছ—পতিত হচ্ছ। আত্মরক্ষায় সক্ষম হয় নি বলে তোমার বিচারে এই অসহায়া বালিকা যদি ভ্রষ্টা বলে গণ্য হয়, তবে এই

ভ্রষ্টাকেই শ্রেষ্টা জ্ঞানে—পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি স্ত্রীত্বে বরণ করে তোমার নিদারুণ অন্যায়ের কিঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করবো। নগণ্য লোকের এই বিদ্রোহ তোমার কাছে আজও উপেক্ষিত হবে জানি, কিন্তু ভেবে দেখ, সহস্র সহস্র 'নগণ্য' সন্তানকে উপেক্ষা করে—অবিচারে অত্যাচারে সমাজচ্যুত করেই আজ তোমার এই দুর্গতি কিনা? সেই উপেক্ষিত বিতাড়িতরাই অন্য সমাজ পুষ্ট করে তোমার সেই দারুণ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে আসছে—এখনও সাবধান!

এমনই আবেগের সঙ্গে ভদ্রলোক এই কথা গুলো বল্‌ছিলেন যে মাঝে মাঝে তাঁর গলা যেন কেঁপে উঠেছিল, তাই আমার শরীরটা ও সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন—আপনি যদি আমাকে নিজের অযোগ্য মনে করেন, তার জন্য আপনাকে দোষ দোবো না। কেননা, আমার বয়স হয়েছে ৩৭ আর আপনার বোধ হয় ১৯।২০র বেশী নয়। তবু আপনাকে এইটুকু বলতে চাই যে এখানে আপনার জীবন হয়ত নিরাপদেই কেটে যাবে, কিন্তু তাতেই কি জীবনের সার্থকতা? এমন কি, আমার মতো একজন অযোগ্য লোককেও যদি বে করেন, তাহলেও সম্ভবতঃ নিরাপদেই জীবন কাটবে, অধিকন্তু কিছু কাজ করবারও হয়তো সুযোগ পাবেন। আপনার মতো আর দু'টি লাঞ্ছিতাকেও যদি উদ্ধার করতে পারেন—মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন—তবেই না আপনার এই নিগ্রহ ভোগ

সার্থক হয়! এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার পরে এই রকম অভাগিনীদের উদ্ধার করাই কি আপনার জীবনের ব্রত হওয়া উচিৎ নয়?

তাঁর এ সকল কথায় আত্মবিস্মৃত হয়ে আশা-উৎফুল্ল-চিত্তে তার মুখপানে চাইতেই চমক ভাঙলো—আমি যে নিতান্তই অযোগ্যা—আমি যে কলঙ্কিণী!

আমার মুখের ভাবে তিনি কি বুঝলেন জানিনা, বললেন—এখনই আপনাকে উত্তর দিতে হবে না। কাল সন্ধ্যায় ফের আসবো, তখন আপনার জবাব পেলেই চলবে। পরশু ভোরের ষ্টীমারে আমি চলে যেতে চাই। ততক্ষণ আপনি সব দিক ভেবে দেখুন। নিজের দায়িত্বে একজন অপরিচিত লোকের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে দ্বিধা হয় বৈ কি?

আমাদের নিকট বিদায় নিয়ে মিঃ রায় চলে গেলেন। তখন সিষ্টার আমাকে অনেক বুঝালেন—অনেক উৎসাহ দিলেন—আমার ভবিষ্যত জীবন যে জ্ঞানে পুণ্যে কতদূর সার্থক হয়ে উঠতে পারে তারই যেন একখানি সুন্দর ছবি একে সামনে ধরলেন, আমি কেমন আশা-আন্দোলিত-চিত্তে সেখান থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে চলে গেলাম।

———৫———

— ১৭ —

গত দু'মাসের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে আমার জীবনে এই নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে—আমাদের বেলতলি গ্রামে মায়ের সেই স্নেহের আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে কত বিঘ্ন বিপত্তি ও নির্য্যাতনের ভিতর দিয়ে অবশেষে চাঁদপুরের এই মুক্তি ফৌজের আশ্রমে এনে ফেলেছে—সেই সব কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে মনে হয়েছিল, এ জগতে বুঝি স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি কিছুই নেই,—আছে বুঝি কেবল অবিচার অত্যাচার ও শঠতা। কিন্তু না এত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তো মাঝে মাঝে তাঁর করুণার পরিচয় পেয়েছি—দাইমা ও কুমোদিনী সিষ্টার, তারপর এই দূরাগত ভদ্রলোকের এই অসীম সহানুভূতি - এই অদ্ভুত প্রস্তাব। না, ভগবান আছেন, নিশ্চয়ই আছেন; আছেন বলেই হতাশ প্রাণেও আবার আশার প্রদীপ জ্বলে উঠে। ঠাকুর, আর ত আমার সবই গেছে, দেখো বিশ্বাসটুকুও যেন না হারিয়ে ফেলি!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে কলঙ্ক ঘটলে মাও সন্তানের স্নেহ বিস্মৃত হন—একমাত্র সন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—মিঃ রায় কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যে আকৃষ্ট হয়েই কোন্ দূর দেশ থেকে ছুটে এসেছেন—তেমনি এক "ভ্রষ্টাকেই শ্রেষ্ঠা

জ্ঞানে স্ত্রীত্বে বরণ করে নিতে” অদ্ভুৎ প্রবৃত্তি! যিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ—তাছাড়া যিনি বড় চাকুরী করেন—আমার মতো একটা কলঙ্কিনী নারীকে বিয়ে করবার খেয়াল তাঁর কেন? এই কন্যা দায়ের দেশে, যে দেশে মুর্খ, পঙ্গু, এমন কি লম্পটের হাতেও কত দুঃস্থ পিতা মাতা আগ্রহে কন্যা দান করেন, সে দেশে আমার চেয়ে শত গুণে ভাল পাত্রী ত অনায়াসেই তাঁর জুটতে পারে। এ কি তবে শুধু দয়া সহানুভূতি? তুচ্ছ একটা নারীর প্রতি এত দয়া? কেন, নারীর আবার মূল্য কি? সেতো ডাক্‌টিকেটের চেয়ে বেশী নয়। ডাক্‌ঘরের ছাপমারা ডাক্‌টিকেট যেমন আর কোন দিন কোন কাজেই লাগে না, স্ত্রীলোকও বুঝি তেমনি—একজন পুরুষের ছাপ তার গায়ে একবার লেগে গেলে, ঐ ডাক্ টিকেটের মতোই সেও অচল-অব্যবহার্য্য। তবে এমন জ্ঞানী লোকের এ প্রবৃত্তি কেন?

আচ্ছা, তিনি যে আমার নিগ্রহ ভোগ সার্থক করবার কথা বল্‌ছিলেন, সে কি করে সম্ভব! এমন সর্ব্বনাশের আবার সার্থকতা কি? ইহ্‌কালে যার শত অপমান—অশেষ নির্য্যাতন, আর পরকালে যার অনন্ত নরক, সেই পতিতার জীবনে আবার সার্থকতা কোথায়? তিনি আরও বল্‌ছিলেন যে আমার মতো অভাগিনীদের উদ্ধারই আমার জীবনের ব্রত হওয়া উচিৎ। কিন্তু যাদের এত বড় সর্ব্বনাশ ঘটে গেছে তাদের আবার উদ্ধার কি? তারা ত ছাপ মারা ডাক্‌টিকেটের

চেয়েও অধম, কেননা ছাপ মারা ডাকটিকেট দূরে নিক্ষেপ করে লোকে তাকে ভুলে যায়, কিন্তু ধর্ষিতা নারীর সে সৌভাগ্যেরও আশা নেই। সে ফুট্‌-বলের মতো লাথি খেতে খেতে চিরদিন পুরুষের পায়ে পায়ে ফিরবে—ক্ষত বিক্ষত হয়ে তিলে তিলে মরবে—আর তার ঐ জীবনব্যাপী লাঞ্ছনার পুরস্কার সমগ্র মানব সমাজের ঘৃণা ও অভিশাপ।

* * *

পরদিন সন্ধ্যায়ও মিঃ রায় আবার এলেন, এবং সিষ্টারের আদেশে সেদিনও আফিস্ ঘরে গিয়ে তাঁদের সামনে আমাকে চেয়ারে বসতে হলো।

অভিবাদনাদি সেরে মিঃ রায় আমার মতামত জানতে চাইলেন, আমি কিছুই বলতে পারলাম না। তাঁর প্রশ্নে আমি কুণ্ঠিত হচ্ছি দেখে বল্‌লেন যোগ্যতর ব্যক্তির অভাবে আমি যদি তাকেই বিয়ে করি তবু আমাদের এই দুঃস্থ সমাজের পরিচর্য্যার সুযোগ পাবো, নইলে তিনি এত করে বলতেন না, কেন না তিনি বেশ জানেন যে, তার বয়েস বা অবস্থা কোনটাই লোভনীয় নয়।

তাঁর ঐ কথার উত্তরে অনেক কথাই আমার বলতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু পারলাম না—সব কথাই কেমন গুলিয়ে গেল। অবশেষে প্রাণ-পণ চেষ্টায় যা বললাম তাও এতই ক্ষীণ কণ্ঠে যে হয়তো তিনি সবটা শুনতে পান নি। বললাম যে না, তার জন্যে নয়, তবে ইচ্ছে করে ধর্ম্মে আরও পতিত হবো

কি বলে? আরো যা মনে এসেছিল কণ্ঠে আট্‌কে গেল—বলা হলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটি দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন—এতে ধর্ম্মে পতিতা হবেন? তা হতে পারে, কিন্তু এতেই যদি ধর্ম্মে পতিতা হন, তাহলে ধর্ম্মে পতিতা হওয়াটা বিশেষ দুর্ভাগ্য বলে তো আমার মনে হয় না। জীবনটাকে পণ্ড না করে সার্থক করতে গেলে, অক্ষম পঙ্গু হয়ে না থেকে সুস্থ সবল ও সৎ কর্ম্মী হতে গেলে, যদি ধর্ম্মে পতিতা হতে হয়, তবে সেকি বাঞ্ছনীয় নয়? ভেবে দেখুন যে, ধর্ম্মে পতিত বা উত্থিত হওয়া প্রচলিত একটা জন-মত ভিন্ন আর কিছুই নয়, তার জন্য আপনি এই অমূল্য মানব জীবন বৃথা নষ্ট করে দেবেন? যে অন্ধ সমাজ বিনা বিচারে 'পতিতা' বলে আপনাকে দূর করে দিয়েছে—প্রতি নিয়ত শত শত পুরুষ নারীকে বর্জ্জন করে নিজে দিন দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ও হীন হতে হীনতর হয়ে যাচ্ছে, তার একটা ভ্রান্ত মতের জন্য আপনার জীবন যৌবন সবই পণ্ড করে দেবেন? ঐ দারুণ অভিজ্ঞতার পরেও দুঃখী তাপি, নিপীড়িতদের দিকে—এই মুমূর্ষু সমাজের পানে একবার চাইবেন না? যাঁদের জীবনে আপনার মতো এমন কোন বিপর্য্যয় ঘটে নি, সমাজের অধঃপাতের পরিণাম তারা কি বুঝবে? তার বুঝবার সুযোগ যাদের ঘটেছে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার দায়িত্বও যে তাদেরি। সে কর্ত্তব্যে অবহেলা করলে কি পাপ হবে না?

তাছাড়া—পরিবারের শাসন থেকে, সমাজের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেও নিরাপদে জীবন কাটানোই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে দেশের দুঃখ বুঝবে কে—তার সেবা কে করবে? আপনার সামনে যে মস্ত সুযোগ তা ছেড়ে ব্যর্থতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবেন? কে জানে, একদিন হয়তো এর জন্যও আপশোষ করতে হবে!

— ১৮ —

তাঁর উচ্ছ্বাসময় ঐ কথাগুলি শুনতে শুনতে আশা ও নিরাশায়, ভয় ও উৎসাহে, আমার মন নানা ভাবের সমাবেশে বড়ই উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, বলবার মতো কোন কথাই খুঁজে পেলাম না। আমার উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করে তিনি আবার বলতে লাগলেন—আমি বুঝতে পারছি না যে সমাজের প্রতি আপনার এই প্রগাঢ় অনুরাগ, যার মতামত আপনার কাছে এতই মূল্যবান যে তার জন্য জীবনে সব সুখে, সকল কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলী দিতেও আপনার মনে একটিবারও দ্বিধা হচ্ছে না—সে সমাজ আপনার কি কল্যাণ করেছে? আপনার প্রয়োজন বা মতামতের অপেক্ষা না রেখে ছেলেবেলাই আপনার বে দিয়ে ছিল, অর্থাৎ আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করেছিল। তারপর আপনি যখন বিধবা হলেন, অর্থাৎ

সে বাজি যখন তাঁরা হেরে গেলেন, সমাজের চাঁইগণ তখন গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন—হায় হায়, তাঁরা এত করে কুল-শীল দেখে, ঠিকুজী কুষ্টি মিলিয়ে শুভ লগ্নে বে দিলেন, তবু এই অলক্ষণে অপয়া মেয়েটার কপালে তা সইলো না। যাও এখন বাকী জীবনটা বিধি মতো ব্রহ্মচর্য্য কর গে, আমাদের আরো শত শত গৌরী দানের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা ত ঐ বলে সরে পড়লেন, কিন্তু ঐ অভাগিনী বাল-বিধবা ব্রহ্মচর্য্য সত্ত্বেও যে ক্রমে বড় হয়ে উঠছে, কবে সে কৌশোরের কোটা ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছে, তা লক্ষ্য করবার অবসর তাঁদের কোথায়! যুবতী বিধবারও প্রেমের তৃষ্ণা পায় কিনা—স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগে কিনা—এবং তার অভাবে নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার তাদের জীবন দুঃসহ করে তোলে কিনা তা দেখবার আর প্রয়োজন নেই, কারণ ও সব আকাঙ্ক্ষা যে বিধবার নিষিদ্ধ। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, ঐ নিষেধ যদি মানুষের না হয়ে বিধাতারই হতো, তবে কি ঐ নিষিদ্ধ বাসনা গুলি বিধবার প্রাণে জাগতেই পেতো?

আমার কথা শুনে আপনি হয়ত ভাবছেন আমি নেহাতই সমাজ-দ্রোহী, কিন্তু তা আমি নই। যে অসঙ্গত ব্যবস্থায় সমাজ ও দেশের অকল্যাণ হচ্ছে—যে পাপে ভারতের বিপুল শক্তি অসার নিস্পন্দ—নীরবে তা মেনে চলায় সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না, বরং অবহেলারই তা নিদর্শন। আর বিদ্রোহী হয়েও যদি সমাজের দোষ ত্রুটী কিছুমাত্র সংশোধন

করে তাকে সুস্থ সবল করে নিতে পারি তা'হলে কি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় না? আর একটি কথা ভেবে দেখবেন, যে সমাজ আপনার বর্ত্তমান দুর্গতির জন্য দায়ী—আপনাদের গ্রাম্য সেই সমাজের প্রতি ত আপনার শ্রদ্ধার অন্ত নেই; কিন্তু যে দেশ-মাতার ক্রোড়ে আপনি জন্মেছেন—যার জল বায়ু ও অন্নে আপনার দেহের লাবণ্য ও অঙ্গের পুষ্টি; জীবনের খেলা মিটিয়ে যেদিন যেতে হবে—তাঁর এত স্নেহের কি প্রতিদান দিয়ে যাবেন—নিজ অস্তিত্বের কোন চিহ্ন রেখে যাবেন? যাঁরা ছেলে পুলে রেখে যান, তারা অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারেন যে আমি যা করতে পারিনি আমার ছেলে মেয়েরা তা করবে—আমি যে ঋণ রেখে গেলাম আমার ছেলে মেয়েরা তা শোধ করবে কিন্তু আপনার তৃপ্তিহীন জীবনের শেষে ঐ সান্ত্বনাটুকুও ত আপনি পাবেন না। সে যে কত বড় দুর্ভাগ্য আজ তা ধারণা করতে না পারলেও জীবনের অবেলায় পৌঁছে পারবেন—তাতে লাভ নেই পরিতাপই সার।

নিজের অপরিসীম দুর্ভাগ্যের এমন মর্ম্মান্তিক বর্ণনা শুনতে শুনতে আমার সমস্ত অন্তর বিষাদের গাঢ় মেঘে ছেয়ে গেল, দু'টি চোখ প্লাবিত করে অশ্রু নেমে এল। সিষ্টার তা লক্ষ্য করে বললেন—কাঁদছো কেন সুশীলা, ইনি ত সত্যি কথাই বলেছেন। স্বর্গের দুয়ার খুলে ধরেছেন তোমার কাছে, এতে এত ভাব্‌বার কি আছে?

আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল যে অনেক দাগা পেয়ে আমি বেশ জেনেছি দয়া মায়া এ জগতে কত বিরল। ইনি যে কত মহৎ তা কি আর আমি বুঝিনি, কিন্তু আমি নিজে যে কি তা কেমন করে ভুলবো? শুধু যদি বিধবা বিয়ের প্রস্তাব হ'ত তবে না হয় কথা ছিল, কিন্তু আমার এই দেহ অপবিত্র জেনে কেমন করে তা এমন দেবতার চরণে নিবেদন করবো? কিন্তু হায়, মুখ ফুটে একটি কথাও বলা হলো না, দারুণ নৈরাশ্যে মন আচ্ছন্ন করে বাক্-শক্তি লোপ করে দিয়েছিল, তাই শুধু মাথা নেড়ে নিজের অযোগ্যতা জানালাম।

আমার আপত্তিতে বিস্মিত হয়ে সিষ্টার বলে উঠলেন—তুমি কি বলছো সুশীলা! এত কষ্টের পরেও এমন স্বর্গ হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলে দেবে?

মিঃ রায় দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—না সিষ্টার, ওর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবেন না। যাকে ওর অপছন্দ তাকে প্রত্যাখ্যান করবার অধিকার অবশ্যি ওর আছে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—এ দু'দিনে আপনার কাছে অনেক বকেছি— মাষ্টারী করে করে ঐটে কেমন এক বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে— সুযোগ পেলেই বক্‌তে থাকি। শুধু বকা নয়, হয়তো এমন অনেক কথাই বলে ফেলেছি যা শুনে আপনার মনে কষ্ট হয়েছে। এখন তার জন্য অনুতাপ করলেও ব্যথা যা দিয়েছি তা কমবে না। সিষ্টারের কাছে শুনেছি, আপনার ঐ দুর্ঘটনার পর নাকি জন কয়েক লোক অত্যন্ত অসঙ্গত প্রস্তাবাদি করে

আপনাকে জ্বালাতন ও অপমান করেছে! আমার প্রস্তাবও হয়তো অত্যন্ত অসঙ্গতই হয়েছে, কিন্তু দয়া করে শুধু এই টুকু বিশ্বাস করবার চেষ্টা করবেন যে ঐ লোকগুলির মতো প্রলুব্ধ হয়ে বা আপনার সম্বন্ধে কোন লঘু ধারণা নিয়ে আমি আসিনি; আমি এসেছিলাম—যাক্ সে কথা। আশা করি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।

তারপর সিষ্টারের সঙ্গে ইংরেজিতে দু'চারটি কথা বলে ও করমর্দ্দন করে, ফের আমার দিকে ফিরে বল্লেন—সিষ্টারের তত্ত্বাবধানে আপনার কোনও কষ্ট হবে বলে আমার মনে হয় না। তবু যদি আপনার মনে হয়, যে আমার দ্বারাও আপনার সামান্য কোন কাজ হ'তে পারে, তবে দয়া করে মজিদগঞ্জের ঠিকানায় দু'লাইন লিখে পাঠালে কৃতার্থ হবো। বিশেষ কিছু করবার তো অধিকার দিলেন না, তবে দরকার হলেও যেন আমার ধৃষ্টতা মনে রেখে শাস্তি দেবেন না।

তাঁর কথায় আমার বুক ভেঙ্গে কান্না আস্‌ছিলো কিন্তু তিনি কি ভাববেন বলে অতি কষ্টে তা সম্বরণ করলাম। তিনি অতি ধীরে ধীরে দরজা অবধি গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর আবেদন পূর্ণ বিষণ্ণ দৃষ্টি আমার প্রতি স্থাপন করে বোধ হয় কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি বের হয়ে চলে গেলেন।

সিষ্টার ও আমি কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলাম না। পরে বেদনা জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন—

সুশীলা, সত্যি তুমি বড়ই অভাগিনী, নইলে এমন দুর্বুদ্ধি তোমার হবে কেন?

যে অশ্রু কোন মতে এতক্ষণ রোধ করেছিলাম, সিষ্টারের ঐ কথায় অঝোরে তা ঝরতে লাগলো। তিনি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌ছিলেন। চোখের জলে সবই যখন আমার দৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল তখন, সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনে যেম্‌নি করে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তেম্‌নি করে তাঁর সেই স্থূল কোমল বাহু দুখানি দিয়ে সস্নেহে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন—কেন আর কাঁদছো সুশীলা! তুমি যা ভাল বুঝেছ করেছ, আমার কোনও ক্ষতি করোনি। তুমি সুখী হয়েছ—উন্নতি করেছ দেখলে আমার বড়ই আনন্দ হতো, কিন্তু উন্নতি তো তুমি চাইলে না! যাক্‌ আমার দ্বারা তোমার যতটুকু উন্নতি সম্ভব তার চেষ্টা আমি করবো, কিন্তু আমার সময় ও সামর্থ্য কম আর মিঃ রায়ের মতো অসাধারণ একজন লোকের হাতে পড়লে সঙ্গ গুণে তুমি একেবারে সোণা হয়ে যেতে পারতে। সংসর্গ ও সুযোগ পেলে মানুষ কি থেকে কি হতে পারে তাঁর হাতে পড়লে নিজের জীবনেই তুমি তা উপলব্ধি করতে পারতে, যাক্‌, এখানে থেকেও সাধ্য মতো সে চেষ্টাই করতে হবে। যাও আর কান্নাকাটি করো না—এখন নিজের ঘরে যাও। তুমি কেন যে কাঁদছ তার কিছুই আমি বুঝতে পারছি নে।

সেখান থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে

বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অন্যান্য মেয়েরা তখনও কেউ ঘরে ফিরে নাই, আমি বেঁচে গেলাম। সিষ্টার আমার কান্নার কারণ বুঝতে পারেন নাই, আমি নিজেই কি তার কারণ জানি? সত্যি তো, স্বেচ্ছায় যা ত্যাগ করেছি তার জন্য আবার আপশোষ কি—কান্না কিসের? কিন্তু হায় ক্রন্দন কি সব সময়েই যুক্তি কারণের অপেক্ষা রাখে? কখনো কখনো অকারণেই অমনি অবসাদের মেঘ উঠে মনকে এতই আচ্ছন্ন করে তোলে যে কান্নার বেগ চাপে সাধ্য কার!

আচ্ছা মিঃ রায় তো নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করে ব্যথা পেয়ে চলে গেলেন—তার বয়স ও অবস্থা আমার পছন্দ হলো না ভাবলেন; কিন্তু তা তো সত্যি নয়। মেয়ে মানুষ কবে আবার কাকে অপছন্দ করে? অবস্থা, আমার চেয়ে হীনাবস্থা কার যে আমি অন্যের অবস্থার কথা ভাব্‌বো! তাছাড়া সমাজ ও স্বজন বর্জ্জিতা কলঙ্কিণী নারীর আবার অপছন্দ! এ যে ভিখারির পক্ষে রাজ ভোগের আব্দারের মতো শুনায়। অত বুদ্ধিমান হয়েও তিনি বুঝলেন না কেন আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং অমন সৌভাগ্য থেকে নিজেকেই বঞ্চিত করেছি; কারণ আমি কলঙ্কিণী—আর তিনি দেবতা।

— ১৯ —

গত দু'দিন সন্ধ্যা বেলা সিষ্টার আমাকে তাঁর আফিস্ ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আজও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে চলেছে, তবু ত কেউ আমায় ডাক্‌তে এলো না! কেবল মাত্র দু'টি দিন সন্ধ্যায় সিষ্টারের আফিস্ ঘরে গিয়ে তাঁদের সামনে বসেছিলাম, তার যে কতটা আকর্ষণ তখন বুঝতে পারিনি, আজ পারছি। আজ আর আমার ডাক পড়বে না—আর কোন দিনই না, তা নিশ্চিত জেনেও মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় উৎগ্রীব হয়ে রৈলো।

মিঃ রায়ের প্রস্তাবে যখন অসম্মতি জানাই তখন অবশ্যি বুঝেছিলাম তার সঙ্গে বিয়ে আমার কখনও হবে না, কিন্তু একটি বারও খেয়াল হয়নি যে অই অসম্মতির ফলে চিরদিনের মতো তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ। এ জীবনে আর কখনি তাকে দেখ্‌তে পাবো না—তাঁর অমন সুন্দর উচ্ছ্বাসময় কথা—তার কণ্ঠের অনুচ্চ অথচ সুস্পষ্ট উচ্চারিত বাক্যাবলী, আর কখনো শুনবো না। তখন লক্ষ্য করিনি কিন্তু আজ বুঝ্‌ছি তাঁর আগমনে আমার চির অন্ধকারময় জীবনাকাশ স্নিগ্ধ এক আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। ক্ষণিক

আলোকের পর আবার সেই অন্ধকার, আরও গাঢ় আরও অসহ্য বোধ হতে লাগলো ; কিন্তু বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার এইতো বুঝি ন্যায্য পুরস্কার !

সেদিন রাত্রিকার সকল কাজ সেরে শয্যা গ্রহণ করবার আগেই মনে মনে সংকল্প করেছিলাম যে, যে সৌভাগ্য আমার জন্য নয়, তার জন্য আপশোষ না করে মনকে দৃঢ় করবো— যেমন দাইমা ও কুমোদিনী করেছে। বিছানায় শুয়ে প্রথমে সে চেষ্টাই করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই মনকে বশে আনতে না পেরে অবশেষে হাল ছেড়ে দিলাম। সংসারের সকল সুখে, সকল আনন্দে বঞ্চিত হওয়ার জন্য—একান্ত ব্যর্থতার জন্যই যার জন্ম, তার সাম্‌নে স্বর্গ সুখের এই প্রলোভন কেন, একি বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস নয় ? আলোর পরে অন্ধকার— আশার পরে নিরাশা—এতে বিধবারও যে অন্তর দাহ করে মানুষ তা না জানুক, না মানুক—ভগবান ও কি তা জানেন না ? এই রকম কত কি ভাবতে ভাবতে মিঃ রায়ের একটি কথা যেন কাণে বেজে উঠলো, তিনি বলেছিলেন "এমন সার্থকতার সুযোগ পেয়েও ব্যর্থতাকেই আকৃড়ে ধরে থাকবেন ? কে জানে একদিন হয়তো এর জন্যও অনুতাপ করতে হবে"।

কি আমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী ? আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতেই যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো—একদিন এর জন্যও অনুতাপ করতে হবে ! একদিন—সুদূর ভবিষ্যতের একদিন ? ওগো আমার পূর্ব্ব জন্মের বন্ধু, একদিন নয়—আজই—চির দিনই এর

জন্য আমায় অনুতাপ করতে হবে; আর সে অনুতাপ যে কত তীব্র—কি যে তার মর্ম্মান্তিক জ্বালা—তা যদি তুমি জানতে, তবে কি আর আমার অসম্মতিকে প্রত্যাখ্যান বলে ভুল বুঝতে? ওগো ছদ্মবেশী দেবতা, যে স্বর্গ এনে তুমি আমার সাম্‌নে ধরেছিলে, কতখানি প্রলুব্ধ হয়েও তা থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করেছি, কি করে তুমি জানবে?

কিন্তু কেন করলাম—হায় কেন? তোমার প্রস্তাবে সম্মত হলে আমার সকল আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী, পরিচিত অপরিচিত সকলের চোখে আমি যে আরও হীনা, আরও কলুষীতা হতাম—তাদের ঘৃণা—তাদের অভিশাপ চিরদিনই যে আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতো! তুমি কি জাননা যে পতিতাকে সমাজ থেকে দূর করে দিয়ে দু'দিন বাদে লোক বরং তাকে ভুলে যায়, কিন্তু পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাকে ভোলে না, তাই ক্ষমাও করে না। কারণ সে যত নীচেই নামুক না কেন, সমাজের গণ্ডির মধ্যেই যে থেকে যায়।

আচ্ছা, পুরুষের প্রেমের জন্য স্ত্রীলোক এমন পাগল হয় কেন—কেনই বা তা না পেলে জীবনটা একেবারে ব্যর্থ মনে হয়? কি অমৃত আছে তাতে? সৎ উপদেশ—ধর্ম্মের কাহিনী দিয়ে ক্ষণিকের জন্য মনকে ভোলানো যায়—সমাজের ভয়ে চির দিনের জন্য দমিয়ে ও রাখা যায়, কিন্তু ঐ পিপাসা ত তাতে মিটে না দূরও হয় না! আমি ত নিখিলদার কাছে ও বই থেকে অনেক সদুপদেশই পেয়েছিলাম, কিন্তু সত্যি কি তাতে আমার

আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়েছিল—মনের হাহাকার ঘুচে ছিল? না, তা হয়নি। হয়নি বলেই বুঝি রিয়াজের মতো উচ্ছৃঙ্খল লোকের ভালবাসা পেয়েই মন আমার অতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—বিচার শক্তি লোপ পেয়েছিল! ব্যাচারা রিয়াজ, আমার জন্য আজও হয়ত সে জেল ভোগ্‌ছে!

মিঃ রায় ও কি আমায় ভালবেসেছেন? না—তা কখনো সম্ভব নয়। অমন ধীর গম্ভীর উচুদরের লোক, কি দেখে আমার মতো তুচ্ছ একটা পাঁড়াগায়ে মেয়েকে ভাল বাসবেন? রিয়াজের চোখে আমি সুন্দরী হ'তে পারি, কিন্তু যিনি দেশ বিদেশে কত শত সুন্দরী দেখেছেন, তাঁর চোখে আমার সৌন্দর্য্য? না তা নয়, অনাথা বিধবার দারুণ দুর্গতির কাহিনী শুনে তাঁর মহত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, তাই তিনি এসেছিলেন এ অভাগিনীকে উদ্ধার করতে। শুধু দিতেই তিনি এসেছিলেন—বিনিময়ে কিছুই চান্‌নি। কিই বা তিনি চাইবেন আমার কাছে? আর রিয়াজ! সে আমাকে নিংড়ে লুটে নিতেই উৎসুক ছিল—যা সে দিতে চেয়েছিল তা যে ন্যায্য মূল্যের কমও হ'তে পারে—আমার পক্ষে লোভনীয় নাও হ'তে পারে, এমন সম্ভবনাই হয়তো তার মনে জাগেনি। তবু তার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসার এত আকর্ষণ কেন? রিয়াজ তো মিঃ রায়ের পদ নখেরও যুগ্য নয়, তবু তার প্রেমে যে মাদকতা ছিল, মিঃ রায়ের দেবতুল্য করুণায় ওত তা নেই।

স্ত্রীলোক বুঝি এতই দুর্ব্বল চিত্ত যে কোন পুরুষ তাকে

ভালবাসে জানা মাত্রই তার সঙ্গে দুরত্ব বোধ ঘুচে যায়— লজ্জার বাঁধ অনেকখানি কেটে যায়। কিন্তু কেউ শ্রদ্ধা করে জানলে তা তো হয়ই না, বরং দূরত্ত আরও বৃদ্ধি পায়। কেন এমন হয়? সম্প্রতি যে টুকু অভিজ্ঞতা জন্মেছে তা দিয়ে বিচার করে আমার মনে হয়, ঘণিষ্টতায় হয় ভালবাসার উন্মেষ ও বৃদ্ধি—আর শ্রদ্ধায় বাড়ে—সতর্কতা, সংজ্ঞম ও দূরত্ব। তবু রিয়াজের জন্য এখন আর আমার লোভ নেই। যে ভালবাসায় উদারতা নেই, শুধু মাদকতা আছে—অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই, ভোগ লিপ্সা আছে, সে ভালবাসার আকর্ষণ যতই প্রবল হউক, তার মূল্য কি? কিন্তু মিঃ রায়! শুধু দিতেই ব্যস্ত, পেতে চান না। তাঁর সর্ব্বস্ব ও আমার পক্ষে যথেষ্ট নয় মনে করে তিনি কুষ্ঠিত, কিন্তু বিনিময়ে যে কড়িটি চাইছেন, তাও যে কাণা, সে দিকে তাঁর খেয়াল ভ্রূক্ষেপ নেই।

আগে ভাবতাম নিখিলদার মতো সুন্দর করে গুছিয়ে অমন নূতন নূতন কথা আর বুঝি কেউ বলতে পারে না, কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙ্গেছে। কোথায় লাগে নিখিলদা মিঃ রায়ের কাছে! নিখিলদার কথার ভঙ্গি যতই সুন্দর হোক্ তা যেন কেমন নিষ্ঠুর—কেমন একটা সাশানো ভাব যেন তার মধ্যে প্রছন্ন। তার প্রদর্শিত বন্ধুর পথ থেকে একচুল এদিক সেদিক পা পড়লে আর রক্ষা নেই—একেবারে নরকে পতন; আর মিঃ রায়ের কি অপূর্ব্ব যুক্তি—কী আশা ও আনন্দের বাণী তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত—কী দয়া—কী সমবেদনায়

বিগলিত প্রাণ তাঁর! সব চেয়ে স্মরণীয় তার সেই করুণা কাতর-সৌম্য মূর্ত্তি। তা দেখলে আর তাকে ভয় থাকে না।

হায়, এমন সদাশয় লোককেও আমি স্বেচ্ছায় হারালাম! কিন্তু যাকে গ্রহণ করবার কোনও উপায় নেই, তাকে বর্জ্জন না করেই বা কি করি? যা নিষিদ্ধ, যা হতে পারে না, কি করে তাতে সম্মত হবো? তাছাড়া, আমি যে বিধবা—তাতে কলঙ্কিনী—কোন স্পর্দ্ধায় তাঁর মতো মহানুভবের পত্নী হবো? মিঃ রায়ের ভৃত্য হওয়ার যোগ্যতাও যাঁদের নেই, এমন কি আমারই মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে যাদের আগে সাহস হতো না, এমনও তো কেউ কেউ অতি অসঙ্কোচে আমাকে ডেকেছে তাদের উপ-পত্নী হতে। তাদের ঐ জঘন্য প্রস্তাবে তখন আমি বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হয়েছিলাম—তাদের ঐ স্পর্দ্ধার কারণ তখন বুঝিনি বলে,—এখন বোধ হয় বুঝেছি। যে নারী সতীত্ব হারিয়েছে, সে তো সব কিছুই হারিয়েছে। সে বুঝি সকল গণ্ডিরই বাইরে চলে গেছে—সমাজের বাইরে, ন্যায় অন্যায়ের বাইরে—বুঝি বা ভগবানের এলাকারই বাইরে চলে গেছে। তার প্রতি আর কারু কোন বন্ধন নেই—কর্ত্তব্য নেই। তার মনুষ্যত্ব ঘুচে গেছে, আছে শুধু দেহটা। সেই দেহের সৎ ব্যবহার ঐরকম ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? হায়, লোক চক্ষে এতদূর যার অধঃপতন, মিঃ রায় কিনা চেয়েছিলেন তাকেই পত্নীত্বে 'বরণ' করে নিতে! কি অদ্ভুত তাঁর প্রবৃত্তি—কত গভীর তার সহানুভূতি!

— ২০ —

মহাপাপীর জীবনান্তে যে নরকের ব্যবস্থা, শুনেছি সে নরক অতি ভয়াবহ স্থান; কিন্তু মরণের এ পারেই যুবতী বিধবার জন্য সমাজের যে ব্যবস্থা, সে ওতো ঠিক স্বর্গ বলে উপলব্ধি হয় না। বিধবার অন্তর্নিহিত নারী বৃত্তি গুলি চিরদিন প্রতি মুহূর্ত্তে দমন করে তাকে চলতে হবে,—সমাজের বিধি ব্যবস্থা মেনে চলা ছাড়া তার জীবনের অন্য কোনও উদ্দেশ্যই বুঝি নেই। মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের ছবি নিমেশের জন্যও যদি তার মনে জেগে উঠে তাহলে আর রক্ষা নেই—অনন্ত নরক। বাল-বিধবার জীবন ব্যাপি এই নিষ্ঠুর সংগ্রাম আর মরনেও তার জন্য নরকের আশ্বাস—কি সুন্দর! নারীর বৈধব্য যদি পূর্ব্ব জন্মাকৃত পাপের শাস্তি, তবে পুরুষের বিপত্নীক হওয়াই বা তা নয় কেন? স্ত্রীলোক বিধবা হলে জীবনের সকল সুখ সম্ভোগে বঞ্চিতা হবে—হাসি আনন্দ উৎসব কিছুতেই তার আর কোন অধিকার থাকবে না। সে দেহের নির্য্যাতন করবে—আকাঙ্ক্ষা দমন ও সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করবে—জীবন্মৃত ভাবে থেকে দুঃসহ জীবনের দিন গোন্‌বে—মরণের প্রতীক্ষা

করবে। কিন্তু বিপত্নীক পুরুষের জন্য এ সব কোন বালাই নেই, দ্বিতীয়, কি তৃতীয় বার দার পরিগ্রহতেও তার কোন বাধা নেই। বস্তুতঃ বিপত্নীক হওয়াতে পুরুষের ভোগ সুখের অধিকার বিন্দুমাত্রও লাঘব হয় না। কে বলবে, স্ত্রী বিয়োগ পূর্ব্ব জন্মের পাপের কি পুণ্যের ফলে ঘটে? কারণ, নূতন নূতন স্ত্রীলাভ সকল বিপত্নীকেরই খুব পরিতাপের বিষয় হয় কিনা সন্দেহ।

এই যে সুখ সম্ভোগের বিপুল সম্ভার সাজিয়ে বিধাতা এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় ধরণী রচনা করেছেন তার কতটুকুতে নারীর অধিকার? পুরুষের উদারতা যতটুকু তাকে মঞ্জুর করেছে তার বেশী নয়, কারণ নারী অবলা—পুরুষ প্রবল। তাই পুরুষ নারীর মালিক, স্বামী, ভাগ্যবিধাতা। পুরুষের সম্ভোগের জন্য বিধাতা যত কিছু সৃষ্টি করেছেন, নারীও বুঝি তারই অন্তর্গত। তার জীবনের বুঝি অন্য উদ্দেশ্য, অন্য সার্থকতা নেই! তাই বুঝি তার চরিত্রের এত প্রয়োজন, সতীত্ব হানীতে নির্ম্মম সাস্তি, কিন্তু পুরুষের ঐ সকল গুণে প্রয়োজন হয় না, কারণ তার মালিক সে নিজেই।

এই চমৎকার ব্যবস্থার নিষ্ঠুর পরিহাসটুকু উপলব্ধি করেই মিঃ রায় বোধ হয় বলেছিলেন যে, পরিবারের সাশন ও সমাজের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে অবশেষে নিরাপদে জীবন যাপনই আমার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নয়। সমাজ ও পরিবারের আশ্রয় তবে কি একটা বন্ধন? যে আশ্রয় হারিয়ে—যে স্নেহে বঞ্চিত হয়ে—

শোকে দুঃখে আমি আকুল হয়ে পড়েছিলাম—যার অভাবে জীবনটা নেহাতই বিফল মনে হয়েছে, মিঃ রায় :কনা বললেন যে সে একটা বন্ধন মাত্র। এই আশ্রমের মেয়েরা সেই বন্ধন মুক্ত হয়ে আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে সন্দেহ নেই, তবু সেই বন্ধন ছেদন করতে প্রাণে এত লাগে কেন ?

পরিবারের শাসন ও সমাজের বন্ধন থেকে আজ আমি মুক্তি। তাই নিজের ইচ্ছায় আমি এখানে রইলাম—ইচ্ছে হলে মিঃ রায়কে বিয়ে করে তার সঙ্গে চলেও যেতেও পারতাম। আশ্চর্য্য, অত বড় একটা ব্যাপার আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে! নিজের ইচ্ছে মতো চলার নামই কি তবে মুক্তি ? তাই যদি হয়, তবে এ মুক্তিতে আমার কি লাভ হলো ? কৈ আমি তো পুরুষের মতো পুনঃবিবাহে রাজি হতে পারলাম না—সুখের সন্ধান পেলাম না—তবে এ মুক্তির সার্থকতা কিসে ? মিঃ রায় বলেছেন, আমার মতো অভাগিনীদের উদ্ধারেই এর সার্থকতা। কিন্তু হায়, অবলা আমি—এতখানি শক্তি কোথা পাবো ? শক্তি নেই বলেই বুঝি ব্যাকুল ভাবে তিনি আমায় আহ্বান করেছিলেন, তাঁর হাতে ভর করে ব্যর্থতা কলঙ্ক ও অনুশোচনার অন্ধকূপ অতিক্রম করে যেতে। কিন্তু হায়, এমন সুযোগ ছেড়ে ব্যর্থতার অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে চিরদিনের মতো আমায় বদ্ধ হতে হলো, এতই নিষ্ঠুর বিধিলিপি।

কেন তাকে প্রত্যাখ্যান করলাম '—পাপের ভয়ে ? সর্ব্বাঙ্গে যার কলঙ্ক কালিমার অনুপনের প্রলেপ লেগে রয়েছে, তার আবার

কোন্ পাপের ভয়? কিন্তু তবু ত সংস্কার ঘোচে না। আমি মিঃ রায়ের মতো একজন বিদেশ প্রত্যাগত অখাদ্যভোজীকে বিয়ে করেছি, এ সংবাদে আমার আত্মীয় পরিজন ও গ্রামবাসীগণ যতদূর স্তম্ভিত হতেন, হারাণের উপপত্নী হলে নিশ্চয় তা হতেন না, কারণ আমার মতো অবস্থায় বিয়ে একটা সৃষ্টিছাড়া প্রস্তাব, কিন্তু অপর ব্যাপারটিতে সমাজ অভ্যস্ত কাজেই সেটা তত দোষের মনে হয় না।

সিষ্টার বলেছেন যে মিঃ রায়ের মতো একজন অসাধারণ লোকের হাতে পড়লে সঙ্গ গুণে আমিও সোনা হয়ে যেতে, পাবতাম। ছু'টি দিন মাত্র মিঃ রায়কে দেখেছি—তাঁর সরস সুন্দর কথাগুলি শুনেছি, তবুও বুঝতে বাকী নেই যে আমার মতো লোহাকেও সোনাতে রূপান্তরিত করবার অদ্ভুৎ শক্তি তার আছে। কিন্তু তা সত্বেও তো তাকে ছেড়ে দিতে হলো! নৈলে আমার বিয়ের সংবাদে মা, মামা, মামী, নিখিলদা যে মর্ম্মাহত হতেন, গ্রামের লোক যে টিট্‌কারী দিত এবং সকলেই নিঃশংসয়ে সিদ্ধান্ত করতো যে সুশীলা নিজে ইচ্ছে করে—ষড়যন্ত্র করে—রিয়াজের সঙ্গে পালিয়ে ছিল। বৈধব্য যদি তার অসহ্যই না হবে তবে এত কেলেঙ্কারির পরেও আবার সে বিয়ে করতে যাবে কেন? তাদের ঐ ভুল কোন উপায়েই তো ভাঙ্গাতে পারতাম না।

সত্যি বটে আমি এখন পরিবার ও সমাজের শাসন থেকে মুক্ত, কিন্তু স্মৃতির বন্ধন—মায়ার বন্ধন,—তারা ছেদন করতে পারলেও আমি ত' পারি নাই। মাগো আমার, যে অভাগিনী

কন্যাকে অপরাধিনী বিশ্বাসে তুমি বর্জ্জন করেছ, সে যে আজও শুধু তোমারি মুখ চেয়ে স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলো—অকল্পিত সার্থকতার সুযোগ পেয়েও ব্যর্থতাকেই চির-দিনের জন্য বরণ করে নিলো। মাগো, কোনদিনই কি তুমি তা জানবে না, বুঝবে না? আর কি জীবনে একটিবারও তোমায় দেখতে পাবো না? তোমার ক্ষমা—তোমার এক কণা স্নেহ ফিরে পেলে—তোমার কোলে একটিবার মাথা রাখতে পেলে —মরতেও যে আমার আপশোষ থাকে না মা!

— ২১ —

সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যা-বেলা দেড় ঘণ্টা আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ছটার ঘণ্টা বাজলেই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে—পরস্পরের সাহায্যে চুল বেঁধে নিয়ে মেয়েরা দলে দলে বাগানে বেড়াতে যায়।

প্রতিদিনের অভ্যাস মত আমিও বাগানে বেড়াতে গেলাম। কিন্তু আজ আর কোন দলে জুটে গল্প গুজব করবার প্রবৃত্তি আমার হলো না কোন মতে সকলের সঙ্গ এড়িয়ে দূরে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বোসলাম। অবিলম্বে দু'টি বালিকা বেড়াতে বেড়াতে ঐ নিভৃত কোণটিতেও এসে হাজির হলো এবং ঐ শীতের সন্ধ্যায় আমাকে একাকী দেখে তাদের সঙ্গ নিতে ডাকলো—আমি

গেলাম না। দু'চার বার ডেকে তারা চলে গেল, আমি একাকী বসে এলোমেলো কত কিই ভাবতে লাগলাম। বাল্যেই যে নিজ ভবিষ্যত জীবনের সুখ-স্বপ্নময় রঙিন চিত্র এঁকে আনন্দে নেচে উঠ্‌তো—কৈশোরেই যদি তার সাধের সেই চিত্রখানি পুড়ে যায়—তার সকল আশায় ছাই পড়ে, তবে তার বাকী জীবন কি বিষাক্ত বলে মনে হয় না? যৌবনের প্রারম্ভেই যার সুখ শান্তি সব চলে গেছে, আশার প্রদীপ নিবে গেছে, তার অবশিষ্ট জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই যে নিদারুণ শাস্তি! তাই বুঝি সিষ্টার সেদিন বলেছিলেন, যে 'অনেক কষ্ট পেয়েছ বলে মনে করোনা সুশীলা, যে জীবনের সব পরীক্ষাই তোমার শেষ হয়ে গেছে। তোমার যা বয়েস তাতে এই তো সবে তোমার জীবনের প্রভাত কাটলো বলা যায়। এখনই যদি তুমি মনে করো যে জীবনের সব খেলাই চুকিয়ে এসেছ তবে বড়ই ভুল করবে. মধ্যাহ্ন সূর্য্যের যেমন দুঃসহ তেজ—মানুষের জীবনে যৌবনেরও তাই। জীবনের মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ না হতে কেউ বড়াই করে বলতে পারে না যে তার সব বাসনা—সব বিপদই কেটে গেছে। কারণ বিপদ আপদ যে কেবল বাইরে থেকেই আসে তা নয়—ভেতর থেকেও আসে; কেননা মানুষের মন ত আর পাথর দিয়ে গড়া নয়, সে কাচের মতোই স্বচ্ছ,—তাতে পারিপার্শিক সব কিছুরই ছাপ পড়ে—তাই সে চঞ্চল। তোমার ত সবে যৌবনের প্রারম্ভ—অনেক পরীক্ষা, অনেক সংগ্রামই এখনও বাকী, তাই বুঝতে পারছি না যে অতীতের কলঙ্ক থেকে, বিশেষতঃ ভবিষ্যতের শত-শঙ্কাময় অনিশ্চয়তা থেকে

পরিত্রাণের এমন সুযোগ পেয়েও কেন তুমি তা প্রত্যাহার করলে!'

আচ্ছা, যদি সিষ্টারের উপদেশ মতো কাজ করতাম—পরিজনের অভিশাপ, প্রতিবেশীদের টিটকারিতে ভ্রুক্ষেপ না করে যদি মিঃ রায়কে বিয়ে করতাম—তবে ত আজ অনুশোচনা করতে হতো না। যে আত্মীয় স্বজনের মুখ চেয়ে আমি নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম, তাঁরা তো সমাজের ভয়ে আমাকে বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা করেন নি! তবে কেন অত ভয় পেলাম—কিসের বাধা, কিসের আশঙ্কা? বিধবা ধর্ষিতা নারীর ফের বিয়ে হলে পৃথিবী কি রসাতলে যেতো, না আকাশ ভেঙ্গে পড়তো? যদি তাও হয়, চির বঞ্চিতা. ঘৃণিতা নারীর তাতে কি ক্ষতি?

হঠাৎ কাণে গেল—সুশীলাদি, সুশীলাদি বেশ লোক ত তুমি! সারা বাগান খুঁজে খুঁজে হয়রান, আর তুমি কিনা এখানে এসে লুকিয়েছো। সিষ্টার তোমায় ডেকেছেন, যাবে চলো।

তরুবালার ডাক শুনে হটাৎ চমকে দাঁড়িয়ে উঠলাম। সিষ্টার আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন—কেন? আবার কি কেউ দেখা করতে এসেছে? তাই বা কেন, অন্য প্রয়োজনেও ত তিনি ডাক্‌তে পারেন। তখন মনে পড়লো যে নিখিলদা আমাকে এই বিদেশী খৃষ্টান "মাগির" আশ্রয়ে আসতে নিষেধ করেছিল. সে তো আসে নি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে। নিখিলদা যাই বলুক না কেন, তার স্নেহ মমতার যে পরিচয় পেয়েছি তাই যথেষ্ট, আর দরকার নেই। আমি পরের কাছেই বেশ আছি—চিরদিন

পরের কাছেই থাকবো। যে আত্মীয়েরা আমায় ত্যাগ করেছে তাদের আত্মীয়তায় আর প্রয়োজন নেই।

তরুবালা বললো—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রৈলে যে, যাবে ত চল ?

যন্ত্র চালিতবৎ তার সঙ্গে চলতে চলতে সিষ্টারের আফিস্ ঘরে গিয়ে ঢোক্‌লাম। সিষ্টারের বা দিকে আরাম চেয়ারে কে একজন একখানি কাশ্মিরী শালে আকণ্ঠ ঢেকে শুয়েছিল, তার মাথার দিক খোলা থাকলেও আল্‌মারির ছায়া পড়ায়, দেখা যাচ্ছিল না। ঐ ব্যক্তি নিখিলদা কি অন্য কেউ প্রথমে বুঝতে পারিনি কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়াতেই তাকে দেখে এতদূর বিস্মিত হলাম যে জানিনা কি করে আমার মুখ দিয়ে অর্দ্ধস্ফুট একটি কথা বেরিয়ে গেল—মিঃ রায় !

অতি আস্তে উচ্চারিত ঐ নামটিও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, বললেন—হাঁ, মিঃ রায়ই বটে। সেদিনকার বিদায়ের পরেও আবার আমি আসবো এমন আশঙ্কা নিশ্চয়ই আপনি করেন নি, কিন্তু দেখুন তবু এসেছি।

সিষ্টার বললেন—মিঃ রায়ের অসুখ করেছিল বলে চলে যেতে পারেন নি। আমাদের কাছে খবর পাঠালে অসুধ পথ্যের যা হোক একটা ব্যবস্থা হতো, ডাক্‌বাংলায় আর সে বন্দোবস্ত কে করে দেবে ! তাতেই এতটা কাবু হয়ে পড়েছেন। আচ্ছা মিঃ রায় আজ তো আর জ্বর নেই—এ বেলা কি খাবেন ?

—চা টোষ্ট্ আর হয়ত দু'একটা আধ-সিদ্ধ ডিম খাবো ভেবেছি।

—সে না হয় আজ এখান থেকেই খেয়ে যান। আমি করে আনছি, এক্ষুনি হয়ে যাবে। এই বলে তিনি তাড়া-তাড়ি বেরিয়ে চলে গেলেন, মিঃ রায়ের আপত্তিতে ভ্রুক্ষেপও করলেন না।

— ২২ —

সিষ্টার চলে যাওয়ায় মিঃ রায়ের সঙ্গে একাকী ঐ ঘরে বসে থাকতে আমার বড়ই লজ্জা ও অশোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। একবার মনে হলো, উঠে চলে যাই কিন্তু এই উঠি এই উঠি করেও উঠ্তে পারলাম না। অলক্ষ্যে একবার তার মুখের পানে চেয়ে দেখলাম, দু'দিনের জ্বরেই তাকে অনেকখানি রুগ্ন দেখাচ্ছে; বিশেষতঃ তার চুল আচড়ানো ও দাঁড়ি কামানো হয়নি বলে দু'টি দিনের মধ্যেই তার চেহারায় অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

সিষ্টার চলে যাওয়ার পর নিঃশব্দে আমাদের সময় কাটতে লাগলো বটে, তবু জানিনা কিসের আশঙ্কায় আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সিষ্টারের অসাক্ষাতে ইনি কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন? এই প্রশ্নটি আমার মনে উদয় হতে

না হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সেদিন আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে ও চলে যেতে পারিনি, আজ ফের দেখা করতে এসেছি বলে নিশ্চয়ই আপনার কাছে খুবই হাস্যাস্পদ হয়েছি না ?

হাঁ হাস্যাস্পদই বটে ! আমার নৈরাশ্যময় জীবনের নিরবাচ্ছিন্ন অন্ধকারময় গহ্বরে নেমে যিনি আশার আলো জ্বেলে ছিলেন —আমার সকল পাপ ও কলঙ্কের বোঝা নিজে মাথা পেতে নিয়ে চরম দুর্গতির কবল থেকে যিনি আমায় স্বর্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—তিনি হবেন আমার চোখে হাস্যাস্পদ ? যার সহানুভূতি এত মধুর, আদর্শ এমন মহান, আত্মত্যাগ এরূপ অতুলনীয়—তিনি হাস্যাস্পদ ? হায় বঁধু, যদি জানতে এ দু'দিন অহরহ কোন নরদেবতার ধ্যান করেছি—তোমাকে হারিয়ে অবধি কি তীব্র অনুশোচনানলে দগ্ধ হয়েছি, তবে কি আর এমন নিষ্ঠুর কথা বলতে পারতে ? এমন কত চিন্তাই ত মনে জেগে উঠলো কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বের হলো না। একটি বার মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম যে না হাস্যাস্পদ হয় নি।

তিনি আবার বলতে লাগলেন—কাল কিনা চলে যাচ্ছি তাই ভাবলাম সিষ্টারের সঙ্গে আর একবার দেখা করে বিদায় নিয়ে যাই। আপনাকে ডাকবার মতো স্পর্দ্ধা আমার হয়নি—সেটা সিষ্টারের কাজ। তবে অবশ্যি ভেবেছিলাম যে দূরে থেকে হয়তো আর একটিবার দেখতে পাবো—আর সেই হবে

এ জীবনে শেষ দেখা। এত কাছে দেখতে পাবো সে আশা আমি করিনি। বিদায় কালিন এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্ত সিষ্টারের কাছে আমার অশেষ ঋণ।

এমন সুরে এভাবের কথা জীবনে আর ত কখনও শুনিনি। ইনি ত দয়া করে অমায় উদ্ধার করতে এসেছিলেন, তবে কেন বলছেন যে আমাকে আর একটিবার দেখতে পেয়ে কৃতার্থ! এ সব কথার মানে কি? সত্যি কি আমাকে ছেড়ে যেতে এঁর কষ্ট হচ্ছে? তাঁর কথায় আমার মন এতই বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে পড়লো যে ক্ষণিক আত্ম-বিস্মৃত হয়ে তাঁর মুখ পানে চেয়ে রইলাম।

অতি আস্তে তিনি ডাকলেন—সুশীলা!

হঠাৎ তাঁর মুখে আমার নাম উচ্চারিত শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমার শিরায় শিরায় যেন তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল—বুক দুর্ দুর করে কেঁপে উঠলো। তিনি বললেন—সুশীলা তুমি বালিকা, আর আমি প্রৌঢ় বল্লেও চলে। কাজেই তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছ বলে তোমায় এতটুকুও দোষ দি না। মণ্ডিদগঞ্জ থেকে যখন বেরুই, তখন একটি দুঃস্থা মেয়েকে উদ্ধার করবো—কৃতার্থ করবো ভেবেই বে'র হয়েছিলাম, কিন্তু সে গর্ব্ব আমার ঘুচে গেছে। এখন আর আমি দাতা নই, আমি প্রার্থী। যদি সাহস হতো তবে বলতাম সে প্রার্থনা আমার কি, কিন্তু তা বলে আরও হাস্যাস্পদ হতে চাই নে।

আবারও সেই কথা! এর উত্তর দিতেই হবে। এ কথার

উত্তর না দিলে যেমন নিজেকে তিনি প্রত্যাখ্যাত মনে করেছেন, তেমনি হাস্যাস্পদও মনে করবেন। কিন্তু উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন, মুখ ফুটে কথা বের হতে চায় না, তবু কোন মতে বলে ফেললাম—আমার চোখে কখনো আপনি হাস্যাস্পদ হন্ নি।

—হাস্যাস্পদ হইনি—বল কি! এখনও কি তবে আমার প্রতি তোমার এতটুকুও শ্রদ্ধা আছে?

এবার কথা বলা তত কঠিন হলো না। বললাম—কেন থাকবে না!

মুহূর্ত্তেক নির্ব্বাক থেকে অবশেষে তিনি বললেন—তোমার মুখের এই কথাটি আমার আশাতীত পুরস্কার। যার ভাগ্যে সারা জীবন কেবল বিফলতাই জুটেছে তোমার ঐ শ্রদ্ধাটুকুর মূল্যও তার কাছে কম নয়। দূর থেকে একবার তোমাকে দেখতে পেলেই কৃতার্থ হয়ে যেতাম, তাতে তোমার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলবার সুযোগ পেয়ে, তোমার মুখে এই কথাটি শুনে, বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে মনের কপাট খুলে দি—সব কথাই আজ বলে ফেলি। এমন সুযোগ ত আর পাবো না—এ জীবনে সম্ভবতঃ আর কখনো দেখতেও পাবো না।

তার শেষ কথায় আমি আপন মনে শিউরে উঠলাম। তিনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি, বলতে লাগলেন—একটা মহত কাজ করবার গর্ব্ব নিয়ে আমি বেড়িয়েছিলাম তোমার সন্ধানে, কিন্তু তোমার অটল তাচ্ছিল্যের স্রোতে সে গর্ব্ব আমার ভেসে গেছে।

আজ কতখানি দীনতা, কতটা শঙ্কা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি তা যদি জানতে সুশীলা!

এই বলে করুণ দৃষ্টিতে ক্ষণিক আমার মুখপানে চেয়ে থেকে পুনরায় বলতে লাগলেন—আমার এ বয়েসে কোন রকম আবেগ প্রকাশ হয়তো নিতান্তই অশোভন, কিন্তু বয়েস হলে কি হয়, বুক ভরা ভালবাসা কোনদিন কাউকে দেওয়ার সুযোগ পাইনি; কারণ স্ত্রীলোকের সংসর্গ চিরদিন সাধ্যমত এড়িয়ে চলেছি। শেষে কিনা একটা খেয়ালের প্রেরণায় এদ্দুর এসে তোমার কাছে এ পরাজয়! যে দারুণ অভিমান—যে গর্ব্ব, দেশ বিদেশে সকল অবস্থায় স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠতা থেকে আমাকে দূরে রেখেছে, আজ তাও আমার রৈল না! এই ত দু'দিন আগে তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছ, তবু কৈ চলে যেতে পারিনি! কোন আশাই নেই জেনেও নির্লজ্জের মতো ফের এসেছি। আমি চিরদিনই তোমার পর থেকে যাবো—তুমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে এখানেই জীবন কাটাবে, এ চিন্তা কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারছি না।

তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমার অন্তরের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে আমায় কেমন আত্মবিস্মৃত করে দিল! তাই অনায়াসেই তাকে বলে ফেললাম—আমি তো আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিনি বরং নিজেকেই বঞ্চিত করেছি।

তিনি ব্যগ্র ভাবে বললেন—আমাকে প্রত্যাখ্যান করোনি—নিজেকে বঞ্চিত করেছ? এ কথার মানে? আমাকে গ্রহণ করতে যদি অমত না থাকে, তবে কেন নিজেকে বঞ্চিত করো?

এই কথা বলতে বলতে তাঁর চেয়ারখানি টেনে আমার আর একটু কাছে এসে বসলেন।

তাঁর সঙ্গে নিরালা এই কথোপকথনে আমার মনের উপর কেমন এক বিহ্বলতা এসে পড়লো। মনে হলো আমার মুখ দিয়ে অন্য কেউ যেন কথা বলছে। নিজের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হলাম—আমার অমত নয়—নিয়তির।

তিনি তখনই কোন উত্তর দিলেন না। এক মিনিট কাল আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে ব্যথিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—এত নিষ্ঠুর ভাবে নিজেকে প্রবঞ্চনা করোনা সুশীলা! অনেক দুঃখ কষ্টই তো পেয়েছ, সাধ করে কেন আর সারা জীবন তাতেই মজে থাকতে চাও? নিয়তির দোষ দিচ্ছ, কিন্তু এ নিয়তি যে তোমারি মন গড়া তা বুঝতে পারছো না?

আমি এ কথার কোনই জবাব দিলাম না। তিনি বললেন—তোমার উপকার করবার গর্ব্ব নিয়ে সেদিন বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, তা তুমি গ্রাহ্য করোনি। কিন্তু আজ আমি নিজেই তোমার কাছে উপকার প্রার্থী আজও কি তেমনি করে আমায় প্রত্যাখ্যান করবে সুশীলা?

তাঁর এই সকল কথায়, বিশেষত তাঁর কাতর দৃষ্টি ও ব্যথিত স্বরে আমাকে এতই আকুল করে ফেলেছিল যে ইচ্ছা হলো তাঁর পায়ে লুটিয়ে বলি "ওগো এম্‌নি করে আমায় বলো না" কিন্তু তা আর হলো না, বল্‌লাম—আমি বড়ই দুর্ব্বল, আমায় এতটা প্রলোভন দেখাবেন না। আমি

নেহাৎই আপনার অযোগ্য, নৈলে এমন স্বর্গ হাতে পেয়ে—কান্না এসে পড়ছিলো তাই আর একটি কথাও বলা হলো না।

তিনি ধীরে ধীরে আমার হাত দু'খানি ধরে বললেন—প্রলোভন নয় সুশীলা—নিষ্কৃতি, নিষ্কৃতি। তোমার নারীত্বের দাবী, বিবেকের আদেশ, ভবিষ্যতের আহ্বান সব অগ্রাহ্য করে আমাদের দুটি জীবন পঙ্গু করো না—এসো। এই বলে তিনি আমার ডান হাতে একটি চুমা দিলেন।

তাঁর স্পর্শে, বিশেষত ঐ চুম্বনে আমার সমস্ত দ্বিধা কেটে গেলো। দু'হাতে তিনি আমার হাত দু'খানি ধরেছিলেন, আমি তার হাতের উপরই কপাল ছোঁয়িয়ে নমস্কার করলাম। পুরস্কার স্বরূপ আবারও তিনি আমার হাতে চুমা দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সিষ্টার তাঁর ট্রেতে করে চা, টোষ্ট, ডিম, ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালাম।

—০—

— ২৩ —

উপরোক্ত ঘটনার পর দিনই ভোরের ষ্টিমারে মিঃ রায় মস্জিদগঞ্জ রওনা হয়ে গেলেন। আমাদের কর্ম্ম বহুল আশ্রম-জীবন আগের মতোই কাটতে লাগলো, তবে মনে হতে লাগলো দিনগুলি যেন বড়ই দীর্ঘ—জীবন যেন বড়ই এক ঘেয়ে।

যথা সময়ে মিঃ রায়ের চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন "সুশীলা এখন থেকে আর আমাদের কোন ব্যর্থতা নেই—পরিতাপ নেই, কারণ অতীতই নেই। যে ভালবাসা এমন খাঁটি, এত গভীর, তার স্পর্শে সকল সন্তাপই আমার ঘুচে গেছে। তোমার ভালবাসা পেয়ে মনে হচ্ছে যে এতদিনকার সকল দুঃখ, সব নিষ্ফলতা নিমেষেই যেন সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনে রেখো সুশীলা, আমাদের অতীতের সকল দুঃখ বেদনা ও বর্ত্তমানের এই আশাতীত সৌভাগ্য সার্থক হবে,—যাঁদের ভেতর থেকে তোমার মতো একটি অমূল্য রত্ন আমি কুড়িয়ে পেয়েছি, সেই লাঞ্ছিতাদের উদ্ধার চেষ্টায়। দু'চার জনকেও যদি উদ্ধার করতে—উন্নত করতে পারি তবেই না আমাদের মিলন সফল হবে?"

ঐ চিঠির পর ক্রমে তাঁর আরও কয়েকখানি চিঠি পেয়েছি।

আর একখানি চিঠির এক জায়গায় লিখেছেন, "আজ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, দুর্ব্বলতা ছেড়ে যাঁরা সবল হয়েছেন, দুঃখ ছেড়ে সুখী হয়েছেন, অজ্ঞতা ছেড়ে জ্ঞানী হয়েছেন, তাঁরাইতো কেবল দেশের সম্বল। দুঃখ তমশার ভিতর থেকে যতই এক একটি করে লোক এদিকে টেনে আনতে পারবে, ততই দেশের বোঝা হাল্কা হবে। আমরা দুজনে মিলে যদি পাঁচটি লাঞ্ছিতাকেও সবল, সুখী ও জ্ঞানী করে তুলতে পারি, তবেই না আমাদের জীবন ধন্য হবে। কারণ আমরা যাদের তুলবো, তারা হয়তো আরো পঞ্চাশ জনকে তুলবে—এমনি করে জাতি সুস্থ, পবিত্র ও মহিয়ান হয়ে উঠবে। সমাজ যাদের নাবিয়ে দেয় তারা ত আর একাই নেবে যায় না—অনেককেই টেনে নাবিয়ে নেয় নিজেদের দলে। সেইটি আমরা এতদিন লক্ষ্য করিনি বলে দেশের এই দুর্গতি। এবার থেকে নাবানো নয়—তোলবার পালা। একবার তোলা সুরু হলে ভারতের উন্নতি কেউ আর আট্‌কে রাখতে পারবে না।"

একদিন সিষ্টারের সঙ্গে রেজিষ্ট্রারের আফিসে গিয়ে বিয়ের নোটিস্ দেওয়া হলো। তারই প্রায় দেড়মাস পরে মিঃ রায় চাঁদপুরে ফিরে এলেন। তিনি পৌছিবার পর দিনই শুধু রেজিষ্ট্রী করে, অর্থাৎ কাগজে স্বাক্ষর মাত্র করে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বাজনা বাজা, লোক খাওয়ানো ইত্যাদি কোন ঘটাই হলো না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্রের নাম অবধি কেউ মুখে আনেনি—এমন কি পুরোহিৎও এলো না—

সম্প্রাদানও হলো না; কারণ পরিবার ও সমাজ বহির্ভূতার বিয়েতে আবার লোকাচার কি?

বিয়ের পর বিকাল বেলা মুক্তি-ফৌজে আমার আশ্রম সঙ্গিনীদের জন্য কিঞ্চিৎ "মিষ্টি-মুখ" ও চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ ব্যাপার সমাধা হতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি আমার পরম হিতৈষিনী সিষ্টার ও আশ্রমবাসিনী মেয়েদের সকলের কাছে সাশ্রু-নয়নে বিদায় নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ডাক্‌বাংলায় চল্‌লাম। আমার পুরানো জীবন, পুরানো পরিচয়, পুরানো সংস্কার, সবই পিছনে পড়ে রৈলো—নূতনের দিকে হাত বাড়িয়ে অজানার দিকে এগিয়ে চল্‌লাম। এক কথায়—সেই লাঞ্ছিতা বঞ্চিতা ভয় চকিতা সুশীলা মরলো, তার স্থানে আবির্ভাব হলো জুতা-মোজা-ব্লাউজাদিতে-সুসজ্জিতা মিসেস্ নিষ্কৃতি রায়ের। যিনি আমায় নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তাঁরই দেওয়া আমার এই নূতন নাম।

বিয়ের পরদিনই ভোরের ষ্টিমারে আমরা চাঁদপুর ছাড়লাম। পথে একটি দিন মাত্র কার্ত্তিকপুরে দাইমার বাসায় থেকে পরদিনই কলিকাতায় পৌঁছিলাম। কার্ত্তিকপুরে সেই সংকীর্ণ দিনটির কথা যখনি মনে পড়ে, চোখে জল আসে। দাইমা আমাদের অভ্যর্থনা করে বাসায় নিয়ে গিয়ে দুজনের মাথায় দুখানি হাত রেখে এমনি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভগবানকে তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রার্থনা জানালেন যে তাতে তৃপ্তিতে

আমার সারাটা মন ভরে গেলো। মনে হলো, আমাদের বিয়েতে ধর্ম্মানুষ্ঠান বাকী ছিল, আজ তা পূর্ণ হলো।

আমার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে দাইমা ও কুমোদিনী যতখানি খুসী হয়েছেন তার চেয়ে বেশী বুঝি আর কেউ হয়নি। সেদিন তাঁদের যে আদর যত্ন পেয়েছি, নিজের মা বোন ছাড়া আর কারু কাছে কি তা আশা করা যায়? তবুত দাইমা আমার সত্যিকার মা নন্—কেউ নন্। আমার যিনি মা তিনি আমাকে ত্যাগ করে সমাজ নিয়ে—সুখে না হোক্—শান্তিতে আছেন। আমার এই সৌভাগ্যের সংবাদে তিনি দাইমার মতো সুখী হওয়া দূরে থাকুক—মর্ম্মাহত হবেন—হয়তো অভিশাপ দেবেন। তাঁদের স্নেহ আশীর্ব্বাদ আমি জন্মের মতো হারিয়েছি, কিন্তু তাঁর বিনিময়ে পেয়েছি দাইমা ও কুমোর অযাচিত স্নেহ মমতা—এ যদি ভুলে যাই তবে ঈশ্বরের এতখানি করুণা সবই অস্বীকার করা হয়।

দাইমার কাছে বিদায় নিয়ে এসে অবধি উনিও একাধিক বার বলেছেন যে শাশুড়ীর স্নেহ যত্ন যে কতখানি মর্ম্মস্পর্শী ঐ একটি দিনেই তার পরিচয় তিনি পেয়েছেন। আমার দাইমা তেম্‌নি লোকই ছিলেন বটে। অর্থ, বল, কি সামাজিক মর্য্যাদা তাঁর ছিল না সত্য, কিন্তু যা তাঁর ছিল ঐ সবের বিনিময়েই কি তা পাওয়া যায়? তাঁর ছিল চরিত্রের দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠা, আর দুঃখী তাপির প্রতি গভীর সহানুভূতি। কার্ত্তিকপুরে যে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তিনি

ছিলেন, সেই গণ্ডির কেই বা তাঁর চরিত্রের পরিচয় পেয়েছে? যার অর্থ ও পদমর্য্যাদা নেই, তার যত গুণ ও জ্ঞানই থাক্‌না কেন, ছোট গণ্ডির মধ্যে তা কারু নজরে পড়ে না, কারণ উন্নত চরিত্রের শত নিদর্শন সত্যেও তা চিনবার লোক প্রায় জোটে না। যে অত ক্ষুদ্র ও অত কাছে, তার মহত্ত্বের উল্লেখেও কেমন হাসি পায়—চোখে দেখলেও তা কেমন নজর এড়িয়ে যায়। তা'হলেও যা গুণ তা গুণই—দোষ নয়, এবং মানুষের মূল্য তার গুণেই—তার পদমর্য্যাদা বা ঐশ্বর্য্যে নয়। আমার সেই উন্নতমনা স্নেহময়ী দাইমা আজ আর ইহ জগতে নেই, (১৯২৫) আমি ও চিরদিন থাকবো না, কিন্তু মৃত্যুর পর-পারে গিয়ে যদি একটিবারও তাঁর দেখা পাই, তবে জানবো যে আমার এত সব পাপ-কলঙ্ক সত্বেও যেখানে আমি গেছি, সে নরক নয়—সেই স্বর্গ।

কার্ত্তিকপুর ছেড়ে পরদিন ভোরে আমরা কল্‌কাতায় পৌঁছিলাম। এখানকার মিয়াদ সন্ধ্যা অবধি, কারণ সন্ধ্যায় আবার পাঞ্জাব মেইল্ ধরতে হবে। সময় অল্প এবং সহর অতি বিরাট, তাই দেখা হলো অতি সামান্যই—চিড়িয়াখানা ও পরেশ নাথের মন্দির। তবু সহরের যেটুকু দেখলাম, চোখ জুড়িয়ে গেল—অদ্ভুত রচনা, ধন্য যাঁরা এ সহরে বাস করেন।

সন্ধ্যায় আমরা ঘোড়ার গাড়ী করে হাবড়ার পোলের উপর দিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে রেল গাড়ীতে চড়ে বসলাম। আগে মনে হয়েছিল কল্‌কাতা সহরের বুঝি সীমা নেই—শেষ নেই। বাড়ীর

গায়ে বাড়ী, রাস্তার পর রাস্তা—যেদিকে যতদূরেই তাকাই, অসংখ্য অট্টালিকা শ্রেণী—এর বুঝি আর শেষ নেই। কিন্তু গাড়ী ছাড়বার পরেই বুঝলাম, এ হেন বিরাট সহরেরও সীমা আছে—শেষ আছে। ঐ অসংখ্য গাড়ী, ঘোড়া, মোটর্—ঐ অফুরন্ত দোকান পাট—রাস্তায় ঐ অগণিত লোকের ভিড়, আজ প্রাতে যেমনি অকস্মাৎ দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হয়েছিল, সন্ধ্যায় আবার তেমনি হঠাৎ যবনিকার অন্তরালে মিলিয়ে গেল।

চলন্ত গাড়ীতে সারাটা রাত কেটে গেলো, পরদিনটিও দেখতে দেখতে অবসান হয়ে এলো। শুনলাম মজিদগঞ্জ পৌঁছিতে আর বড় বিলম্ব নেই। কত গ্রাম সহর ও দেশ দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি—কত দেশ বিদেশের লোক—কত নদী, বন ও পাহাড়ের সাক্ষাতই না ঘটেছে! ঐ সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে একাধিকবার আমার মনে হয়েছে, সত্যি আমিই কি বেলতলী গ্রামের সেই চির অবহেলীতা দুর্ভাগিনী সুশীলা?—সেই দুঃখ দৈন্যে প্রতি-পালিতা—সেই সমাজ পরিত্যক্তা কলঙ্কিনী বিধবা?—এ জীবনেই আবার এমন স্বামী পেয়েছি? সত্যি কি আমার সকল দুঃখ দুর্গতির অবসান হয়েছে? এ যদি স্বপ্ন হয় ঠাকুর, দেখো এ স্বপ্ন যেন আমার জীবন থাকতে না ভাঙ্গে!

আমরা যখন মজিদ্‌গঞ্জে নাব্‌লাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হেড-মাষ্টার মহাশয়ের স্কুল সংলগ্ন বাসাখানি ষ্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়—পৌঁছিতে বিলম্ব হলো না। বৃদ্ধ চাকর দুজাহি, আমাদের জন্য রন্ধনাদি সেরে, নব-বধূর

অভ্যর্থনার জন্য ক্ষুদ্র বাসাখানিকে বিশেষ ভাবে আলোকিত করে রেখেছিল—সে সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করলো। স্কুলের ছাত্র এবং প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষ কয়েকজন এসেছিলেন, তাঁরাও সাদর অভ্যর্থনা জানালেন! এত লোকের সাদর সম্ভাষণের মধ্যে এই নূতন দেশে স্বামী গৃহে প্রবেশ করলাম--কৃতজ্ঞতায় আমার সারাটা মন ভরে গেলো।

— ২৪ —

মজিদগঞ্জে এসেই আমার এক নূতন জীবন সুরু হলো, কারণ এতদিনে আমার জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির হয়ে গেছে—পতিতা রমণীদের উদ্ধার। আমার মতো নগণ্য একটা স্ত্রীলোকেরও যে জীবনের কোন লক্ষ্য থাকা দরকার, এমন অদ্ভুত কথা আগে কখনো মনেও জাগেনি. ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তাই জগতে এসেছি—যেদিন ডাক্ পড়বে, চলে যাবো—এতে আর লক্ষ্যের প্রয়োজন কি? প্রত্যেক মানুষের জীবনেই যে একটি করে লক্ষ্য থাকা আবশ্যক—তা থাকলে সার্থকতার সন্ধান মেলে—জীবনের মূল্য বেড়ে যায় তা এতদিন আমার জানা ছিল না,—তাই দুঃখ আপশোষেই দিন কাটছিলো। আজ সে তত্বটি জেনেছি বলেই দুঃখ পরিতাপের আর অবকাশ নেই, রাত-দিনই কেবল

লেখা-পড়া। সংসারের কাজ আমার বেশী নেই, কাজেই লেখা-পড়ার সময় যথেষ্ট। তার উপর স্বামী নিজেই আমার শিক্ষক, এবং আমাকে পড়াবার উৎসাহও তাঁর অদম্য; কারণ আমার শিক্ষার উপরই না ভবিষ্যতের কাজ কর্ম্ম—জীবনের লক্ষ্য নির্ভর করছে!

লেখা পড়া ও কাজ কর্ম্ম নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন, সিষ্টারের সেই কথাটি প্রায়ই আমার মনে পড়ে। তিনি বলে ছিলেন—"মিঃ রায়ের মতো একজন অসাধারণ লোকের হাতে পড়লে তুমি সোণা হয়ে যেতে পারতে।" সোণা হওয়া কাকে বলে ঠিক জানিনা, তবে তাঁর অসামান্য জ্ঞান ও দেবোপম চরিত্রের কণাটুকুও যদি কখনো আয়ত্ত করতে পারি, তবেই জীবন ধন্য মনে করবো। স্বামীর শিক্ষায়—বিশেষতঃ তাঁর প্রতি-কাজের দৃষ্টান্তে আমি যে মহত্বের আস্বাদ পেয়েছি, তাতে আমার অতীত জীবনের সকল দুঃখ নির্য্যাতনের কালিমাই বুঝি মুছে গেছে। আর, ইহকালে যেমন দুঃখের বেদনা সেরে গেছে—পরকালের নরকের আতঙ্কও তেমনি ঘুচে গেছে। এখন বুঝেছি স্বর্গ নরক মৃত্যুর পরপারে নয়, এপারেই। সমাজ, এমন কি শাস্ত্রও আমার স্বর্গে কি নরকে পাঠাতে পারে না—সেটা নির্ভর করে আমার নিজের অভিরুচির উপর।

স্বামী একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন—যে সমাজ মানুষকে বাড়তে দেয় না, সে সমাজ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হওয়া দুর্ভাগ্য নয়—কিন্তু সে সমাজকে বর্জ্জন করা দুর্ভাগ্য—সে তো যে-সেই করতে

পারে। সমাজকে বর্জ্জন নয়—সংশোধন করতে হবে। সমগ্র জাতিই যদি পাপ অন্ধকারে নিমজ্জিত রৈলো, তবে সমাজ ছেড়ে গিয়ে তোমার আমার মুক্তির প্রয়াসে মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ যদি মহৎ কাজ হয়, তবে দারুণ গরমের দিনে বড় লোকদের কলকাতা ছেড়ে দারজিলীং প্রবাসই বা মহৎ বলে প্রশংসিত হবে না কেন?

আর একদিন বলেছিলেন—তুমি যেমন নিরপরাধীনি হয়েও বিবেকহীন সমাজের অবিচারে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করছিলে, নিরপরাধীনি আরও শত সহস্র নারী আজও হিন্দুস্থানে অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। এত বড় সঙ্কট থেকে উদ্ধার হয়ে আমরা যদি তাদের ভুলে থাকি—স্ত্রীলোকের ঐ বিপদ দূর করবার জন্যই জীবন পণ না করি—তাহলে এর পরে আরও যারা ঐ রকম অত্যাচারে নিষ্পেষিত হবে, তাদের দুর্গতির জন্য আমরাও আংশিক দায়ী হবো। এ যদি অস্বীকার করো, তাহলে অতীতের কাছে মানুষের কোন ঋণ ও ভবিষ্যতের প্রতি কোন দায়িত্বই থাকে না।

* * *

গত দু'টি বছর মজিদগঞ্জে আমাদের বেশ সুখেই কেটেছে, কিন্তু সম্প্রতি স্থানীয় বাঙ্গালীদের একজন মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে গিয়ে কি করে আমার কলঙ্কের কাহিনী জেনে এসেছেন। তার পরেই আমাদের চাকরের স্ত্রীর অসুখ করায় বৃদ্ধ দেশে

চলে গেল, অন্য চাকর আর পাওয়া গেল না। ধোপা খান কয়েক কাপড় হারিয়ে ফেলায় সাহস করে আর বাকী কাপড়ও দিতে এলো না, এবং আর কোন ধোপাও আমাদের কাজ করে তার জাত ভাইয়ের অন্ন মারতে রাজি হলো না। আগে যাঁরা প্রায়ই আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসতেন তাঁরা কাজ কর্ম্মে হঠাৎ এতই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে আর কোন দিনই আমাদের বাড়ী আসবার সময় পেলেন না এক কথায়, আগে যে সহরের লোক আমার স্বামীকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতো, এখন সেই সহরবাসীগণই তাঁকে দারুণ অবজ্ঞার চোখে দেখতে লাগলো। যে স্কুলের ছেলেরা সেদিনও তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতো, তারাই আজ তাঁকে নিতান্ত নীচাশয় বলে সিদ্ধান্ত করেছে; এবং আমার মতো অভাগিনীকে উদ্ধার করেছেন বলেই তাঁর এই পুরস্কার।

একদিন অপরাহ্নে তিনি স্কুল থেকে ফিরলে, তাঁকে চা তৈরী করে দিয়ে আমি ঐ কথাই পাড়লাম। কিন্তু যে ভাবে বলবো ভেবেছিলাম তা হলো না, কথা বলতে গিয়ে কেমন কান্না এসে পড়লো। তিনি আমার হাত দুখানি ধরে বললেন—এ সব ব্যাপারে তুমি এত দুঃখিত হচ্ছ নিষ্কৃতি, সমাজের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে যে দিন তুমি আমায় গ্রহণ করেছ, সে দিনইত লোকের অশ্রদ্ধা অবজ্ঞাকে বরণ করে নিয়েছ। ভেবে দেখো, বিয়ের আগে কেউ আমাদের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা করতো না, কারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো কোন

কিছুই তখন আমরা বুঝিনি। প্রতিবেশীরা এখন যে নানা উপায়ে তাঁদের অবজ্ঞা জানাতে ব্যস্ত, তার কারণ এখন আর তাঁরা আমাদের কথা না ভেবে পারছেন না। এর চেয়ে বড় কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁরা আরও বেশী নির্য্যাতন ভোগ করে গেছেন। আমাদের আদর্শ এখনও বহু দূরে, সে পথে এগুতে চাওত খুব শক্ত হতে হবে। তবে অবশ্যি বুঝতে পারছি, এ সব ব্যাপার তোমার পক্ষে খুবই অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই কথাই ক'দিন থেকে আমি ভাবছি, আর মনে মনে স্থিরও করে ফেলেছি যে এ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবো; কেননা আমি এখানে থাকতে ছেলেদের কুৎসিত আলোচনা থামবে না। আমি ভাবছিলাম, তোমার যদি অমত না হয়, তবে আমরা একবার জাপান বেড়িয়ে আসি। সে দেশে গেলে দেখবার ও শেখবার মতো অনেক কিছুই পাবে। তুমি যা গড়তে চাও—যা করতে চাও তার বহু দৃষ্টান্তই সামনে দেখতে পাবে। হয়তো তোমার মনের কালিমাও ঘুচে যাবে, কেননা দেখবে যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় জাপানী নারী চিরদিনের জন্য পতিতা হয়ে যায় না। পতিতা সেই হয়, যে হীনতাকেই বরণ করে নিয়ে তাতেই ডুবে থাকে।

আমি যাবো জাপান? এমন কল্পনাতীত সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় অশ্রুসিক্ত মুখেও বুঝি আমার হাসি ফুটে উঠলো। আমি মাথা নেড়ে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম। তিনি সহাস্য বদনে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন—সাবাস। তবে কি জান,

কষ্ট করে থার্ড্ ক্লাসে যাতায়াত করতে হবে, নইলে টাকায় কুলুবে না। ফিরে এসে যা হয় একটা কিছু জুটবেই—নইলে কিছুদিন উপোশ—কি বল, রাজি ?

আমি বললাম—নিশ্চয় রাজি।

তিনি আমায় আলিঙ্গন করে আমার সম্মতির পুরস্কার দিলেন।

শ্রীনিস্কৃতি দেবী।